নির্বাচিত গল্প

তপোবিজয় ঘোষ

প্রতিষ্ঠিত প্রকাশক ও লেখকেরা সাহিত্যকে বিকৃত প্রমোদ-পণ্যে পরিণত করেছে। সীমিত সামর্থ্যে সমাজের অনির্বাণ দ্বন্দ্বমুখর জীবন স্পন্দনের শিল্পগুণান্বিত কথারূপকে আমরা পাঠকের দরবারে হাজির করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এর আগে শ্রেষ্ঠ গল্প সিরিজে চল্লিশ ও পঞ্চাশ দশকের তিন সার্থক জীবনমুখী গল্পকার কৃষণ চন্দর, সুশীল জানা এবং সাদাত হোসেন মন্টোর গল্প সংকলন প্রকাশ করেছি। বাজারী বইয়ের বিজ্ঞাপনে কোণঠাসা হয়েও পাঠকদের কাছ থেকে যে সাড়া পেয়েছি তাতে আমাদের আত্মপ্রত্যয় বেড়েছে। তাই সমকালীন সম্ভাবনাপূর্ণ এবং প্রতিষ্ঠিত কথাকারদের 'নির্বাচিত গল্প'-এর এই নতুন সিরিজ শুরু করেছি। এই সিরিজের প্রথম সংকলন সাধন চট্টোপাধ্যায়ের নির্বাচিত গল্প, দ্বিতীয় গ্রন্থ তপোবিজয় ঘোষের নির্বাচিত গল্প।

জীবনমুখী সাহিত্যের আজ অন্যতম ক্ষমতাশালী সমকালীন লেখক তপোবিজয় ঘোষ পঞ্চাশের দশকের শেষ থেকেই স্বাধীনতা, পরিচয়, যুগান্তর, ভারতবর্ষ, শনিবারের চিঠি, বিংশ শতাব্দী, দৈনিক বসুমতী প্রভৃতি পত্রিকায় লিখে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। ১৯৬২ সালের চীন-ভারত সীমান্ত-বিরোধের বিতর্ককালে তিনি বৃহৎ পত্রিকাগোষ্ঠী বর্জন করেন। বিগত জরুরী অবস্থার কালে আকাশবাণীর আমন্ত্রণ গ্রহণেও অস্বীকৃতি জানান। তাঁর কলমের সাবলীলতা, ভাষার প্রাঞ্জলতা এবং বিষয়-নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। লেখালেখিতে তিনি কমিটমেণ্টে বিশ্বাসী। ফলে সমকালীন রাজনৈতিক বিষয়গুলো সাহিত্যের আঙিনায় বলিষ্ঠভাবে উপস্থিত। কলমের জোরেই তিনি যে-কোনো রাজনৈতিক বিষয়কে শিল্পমণ্ডিত করে তুলতে পারেন।

নন্দন, চতুষ্কোণ, লেখা ও রেখা, সারস্বত, সত্যযুগ, মাসিক বাংলাদেশ প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত গল্প, উপন্যাস এবং গবেষণাধর্মী প্রবন্ধের মাধ্যমে তপোবিজয় ঘোষ বাংলা সাহিত্যে নির্দিষ্ট স্থান করে নিয়েছেন। শক্তিশালী এই লেখকের প্রায় তিন দশকের গল্পের সুনির্বাচিত ফসল এই সংকলন, আশা করি পাঠকসমাজে আদৃত হবে।

সংকলনে প্রকাশ করার কালে গল্পগুলো প্রয়োজনবোধে লেখক সংশোধন ও পরিমার্জন করেছেন। গল্প-নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাঁকে সাহায্য করেছেন তাঁর দুই অন্তরঙ্গ বন্ধু ডঃ পল্লব সেনগুপ্ত ও অর্ধেন্দুশেখর দাস। প্রুফ দেখার কাজে সাহায্য করেছে সুচরিতা ঘোষ।

প্রকাশক

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

উপন্যাস

সামনে লড়াই

রাত জাগার পালা

ছোটগল্প

কাল চেতনার গল্প

প্রবন্ধ ও গবেষণা-গ্রন্থ

সুকান্ত অন্বেষা

উনিশ শতকের নীল-আন্দোলন ও

বাংলার সারস্বত-সমাজ (যন্ত্রস্থ)

কথাশিল্পী সাধন চট্টোপাধ্যায়

বন্ধুবরেষু

ভালবাসার চালচিত্র

সবিনয় নিবেদন, আপনার প্রেরিত 'ভালবাসার চালচিত্র' গল্পটি আমাদের সম্পাদকমণ্ডলীর বিচারে অমনোনীত হয়েছে। গল্পটি আমরা মনোযোগ দিয়ে পড়েছি এবং খুঁটিয়ে বিচার করেছি। আমাদের প্রবীণ সম্পাদক মন্তব্য করেছেন, আপনার গল্পগঠনের কুশলতা প্রশংসার যোগ্য, চরিত্রনির্মাণের কৌশল ও ভাষাভঙ্গি প্রশংসার দাবি রাখে। অর্থাৎ এটি যথার্থ পাকা হাতের লেখা হয়েছে। কিন্তু আঙ্গিকের মুন্সিয়ানা থাকলেও আপনার গল্পের বিষয়বস্তু আমাদের খুশি করতে পারে নি। আমাদের আপত্তি ওই বিষয়বস্তু নিয়েই......

আপনি আমাদের কাগজের একেবারে নতুন লেখক নন। যতদূর মনে পড়ছে এর আগে ছোটোনাগপুরের আদিবাসীদের নিয়ে লেখা আপনার একটা গল্প আমরা প্রকাশ করেছিলাম। খুব সম্ভব তাতে দুটি আদিম নরনারীর দেহজ প্রেমের উল্লাস ঘন-অরণ্যের পটভূমিতে ঘনিষ্ঠ রূপ পেয়েছিল। আমাদের পাঠক-পাঠিকা গল্পটি পড়ে খুশি হয়েছিলেন। যদিও আদিবাসীদের জীবনযাপন সম্পর্কে আপনার অভিজ্ঞতায় কিছু ঘাটতি ছিল এবং সেই ফাঁকিটুকু অন্তত আমার অভিজ্ঞ চোখ এড়িয়ে যেতে পারে নি, তাহলেও বিষয়ের বৈচিত্র্যে ও লেখার গুণে গল্পটা দিব্যি দানা বেঁধে উঠেছিল। কিন্তু আপনার এই লেখাটা আমাদের খুশি করতে পারে নি!

দেখুন সুহাসবাবু, আপনার বয়স এখনো কম, অভিজ্ঞতাও সেই অনুপাতে কাঁচা সবকিছু ভালমন্দ আপনার কাছে এখনো পরিষ্কার হয়ে ওঠে নি, প্রবীণতার অধিকার নিয়ে আপনাকে যদি দু'একটা কথা বলি, আপনি তার জন্য ক্ষুণ্ণ হবেন না। আমরা আপনার গুণগ্রাহী, আপনার লেখার মধ্যে যে শক্তি আছে, যে প্রতিশ্রুতি আছে, আমরা তার সম্যক্ বিকাশ চাই। বাংলা সাহিত্যে আপনি প্রতিষ্ঠিত হোন, যশস্বী হোন, এটা আমাদের আন্তরিক কামনা। কিন্তু সুহাসবাবু আপনি যে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই গল্পের বিষয়বস্তু নির্বাচন করেছেন তা তো আপনার গুণগত উৎকর্ষের পরিচয় বহন করে না!

বরং সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন যেন কৃত্রিম, যেন গায়ের জোরে গড়ে তোলা, যেন শাড়ির দোকানে কাঠের নারীমূর্তি, যার গায়ে জমকালো পোষাক-জড়ানো, বাইরেটা সুন্দর, ভেতরটা নিষ্প্রাণ, শুকনো খটখটে খড় আর কাঠের সমাহার !

দেখুন সুহাসবাবু, গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রে আমরা বিষয়ের উপর খুব গুরুত্ব দিই। বিষয়টাই তো আসল, বাকি তো সব সাজসজ্জা। কোনকিছু পড়ার পর পাঠকের মনে বিষয়টুকুই গেঁথে যায়, গাঁথা হয়ে ফুলের মতো ফুটে থাকে ; বাকি যা-কিছু পদ্মপাতায় জলের মতো গড়িয়ে যায়, কখনো দানা বাঁধতে পারে না। আপনি সুহাসবাবু, সেই বিষয়নির্বাচনেই একটা গোলমাল বাঁধিয়ে ফেলেছেন ! অথচ গল্পটার সম্ভাবনা ছিল। চমৎকার সুস্থ সমৃদ্ধ একটা সম্ভাবনা ! আপনি নিজের হাতেই তাকে নষ্ট করেছেন, যেমন কোনো-কোনো রুগ্ন মা-কে শারীরিক অসুস্থতার কারণে আপন হাতে ওষধ মুখে তুলে গর্ভের সন্তান নষ্ট করে ফেলতে হয়......

আসলে সুহাসবাবু, 'ভালবাসার চালচিত্রে' আপনার বলার বিষয়টা কি ? একজোড়া যুবকযুবতী, যাদের যৌবন অতিক্রান্ত হতে চলেছে অথচ অতৃপ্ত যৌবনের স্বাদ-গন্ধ, কাম-কামনা, স্মৃতি-স্বপ্ন, এখনো দেহে-মনে, মুখের রেখায়, চোখের দৃষ্টিতে আষাঢ়ের জলভরা মেঘের মতো ধারাবর্ষণের অপেক্ষায় থমকে আছে, হঠাৎ বহুদিন পরে পরস্পর দেখা হয়ে যেতেই তাদের পুরনো স্মৃতির আকাশে ঝড় উঠল, হৃদ্‌পিণ্ডের দিক্‌দিগন্ত কেঁপে গেল, অতিক্রান্ত যৌবনের দু'খানা শরীর ভেঙেচুরে টালমাটাল হয়ে যেন প্রবল বর্ষণে গলে গলে ঝরে ঝরে পড়তে চাইল......এই তো ? এই তো আপনার বলার বিষয়, বলার ইচ্ছা ছিল ?

কিন্তু এমন চমৎকার গাঢ় গভীর অনুভবের কথা বলার জন্য শহীদ মিনার ময়দান কেন সুহাসবাবু ? সারি সারি মানুষের মিছিল কেন ? এত ভিড়, গোলমাল চিৎকার চেঁচামেচি কোলাহল কেন ? লালনীলহলুদ রঙের এত ফ্ল্যাগ, ফেস্টুন কেন ? এত কুৎসিত কদর্য ভিড়ের মধ্যে, এত মানুষের পায়ে পায়ে উড়ানো ধুলোবালির অন্ধকারে, বেতন চাই বোনাস চাই খাদ্য দাও, দাম কমাও ধরনের এমন কর্কশ কটু, কানের পর্দা-ফাটানো বীভৎস তাণ্ডবের মধ্যে ভালবাসার পাখিরা স্মৃতির খড়কুটো ঠোঁটে নিয়ে কোন্ সাহসে দু'দণ্ড এসে বসতে পারে, আরামে আলস্যে ডানা ঝাপ্টাতে পারে, কিংবা নিশ্চিন্তে একটু গান গাইতে পারে........

দেখুন সুহাসবাবু, যুবকযুবতীর ভালবাসা বস্তুটা বড়ো নরম, বড়ো কোমল, বড়ো বেশি স্পর্শকাতর। তার চালচিত্রে যে রূপ ফোটাতে হয়, যে রঙ ধরাতে

হয়, তাকে তো সাইনবোর্ড করে তুললে চলে না! আপনি বড়ো সার্কাসের বিজ্ঞাপন দেখেছেন সুহাসবাবু? সেখানে টকটকে লালরঙের মোটা পর্দায় সোনালী বর্ণের বাঘসিংহ বিকট রকমের হাঁ করে থাকে, কদাকার কালো হাতীর পিঠে নীলবর্ণের বাঁদরেরা নাচ দেখায়, জেব্রা জিরাফ উটের পাশাপাশি সবুজ রঙের ছাগল, টিয়াপাখি বনমোরগেরা নির্বিঘ্নে অবস্থান করে। আর তারই চালচিত্রে শূন্যে ট্রাপিজের তার থেকে হাঁটু-ভাঁজ-করে-আধখানা-ঝুলেপড়া চৌকোণো-মুখ বলশালী এক পুরুষের পেশল হাতে চ্যাপ্টামুখ, পাছা ও বুক ভারি একটা মেয়ের প্রায়-উলঙ্গ-শরীর লম্বা হয়ে ঝুলতে থাকে এবং সেই অবস্থাতেই তারা রঙমাখা চোখ উল্টে দিয়ে, ভুরু টান করে, উপর-নীচ-ভঙ্গিতে পরস্পর পরস্পরের মুখের কাছে মুখ ঠেকিয়ে এমন একটা গলা-গলা হাসির ভাব দেখায় যেন দীর্ঘ রমণের শেষে এইমাত্র উভয়ে শূন্যলোকে ভ্রমণে নেমেছে! সমস্ত ব্যাপারটাই অদ্ভুত হাস্যকর বলে মনে হয় না সুহাসবাবু?

কিন্তু এভাবে বলছি বলে যেন মনে করবেন না আপনার গল্পের নায়ক-নায়িকারও ওই অবস্থাই হয়েছে! আসলে যে কথাটা বলতে চাইছি তা হল, প্রেম জিনিষটা কোলাহলের নয়, নির্জনতার, একেবারেই নির্মম নিঃশব্দ নির্জনতার। কমবয়েসী তরুণতরুণীর ভালবাসায় মুখরতা যদি-বা কিছু থাকে, উতলানো দুধের ফেণার মতো প্রগল্ভতা যদি-বা কিছু গড়িয়ে পড়ে, কিন্তু অতিক্রান্ত-যৌবনের প্রেম, সে তো দুধ শুকিয়ে ক্ষীর, ঘন এবং গাঢ়, তার চালচিত্রে শহীদ মিনার ময়দানের ফ্ল্যাগ ফেস্টুন আর পোকার মতো মানুষের কিলবিল-করা মিছিল-টিছিল কি আনা যায় সুহাসবাবু? সমস্ত ব্যাপারটাই তাহলে কি এক ধরনের অ-সভ্য অশ্লীল হয়ে ওঠে না? এই ধরুন না, আপনি লিখেছেন:

> সুনন্দার ছোট হাতঘড়িটার উপর সূর্যাস্তের আলো এসে পড়তেই তা কেমন সুন্দর চিকচিক করে উঠল। কাঁচ থেকে সেই আলো মুহূর্তের জন্য প্রতিফলিত হয়ে তার চিবুক ও ডান গালের সামান্য কিছু অংশে একটা সোনালী আলপনা এঁকে অদৃশ্য হল। সোমনাথ তা অনুসরণ করে খুব অবাক হয়ে দেখল, সুনন্দার উঁচু চোয়ালের কাছটায় একটা সরু লম্বা কাটা দাগ। এই দাগটা আগে ছিল কি? পনেরো বছর আগে? দশবছর আগে? স্মৃতি হাতড়ে ব্যর্থ সোমনাথ বুকের মধ্যে কষ্ট পেল। মনে পড়ছে না তো……
>
> সুনন্দা খুব ছোট করে হেসে বলল, 'কি দেখছ?'

সোমনাথ কিছুটা অস্থির গলায় জিজ্ঞেস করল, 'তোমার গালে একটা……'

সুনন্দা চকিতে হাত তুলে ঠিক দাগটার উপরেই আঙুল রাখল। তারপর শব্দ করে হেসে ফেলল, 'ঠিক লক্ষ্য করেছ তো!'

'কি করে হল?' সোমনাথ গম্ভীর, যেন এই মুহূর্তে সুনন্দার অভিভাবক সে, যেন একটা বাচ্চা মেয়ের অবাধ্যতার কৈফিয়ৎ নিচ্ছে। সুনন্দা চোখ বড়ো করে সোমনাথের মুখ দেখল, 'আর বলো কেন, একটা ভী-ষ-ণ দুষ্টু ছেলের কাণ্ড!'

'ছেলে!' সোমনাথ ভুরু কুঁচকে চোখ ছোট করে ফেলল।

সুনন্দা মুখ থেকে হাসিটুকু মুছে নিয়ে গম্ভীর হ'ল, 'আমি এখন বাচ্চাদের একটা স্কুলে কাজ করি। দু তিনটে ছেলে আছে ভীষণ রাগী আর জেদী! ছোটোখাটো গুণ্ডা বললেই হয়! তারই একটা একদিন… …কিন্তু দাগটা তো মিলিয়ে আসছে? আর ক'দিনেই উঠে যাবে……'

সোমনাথ ক্ষতস্থান দেখার উপলক্ষে অনেকক্ষণ খুঁটিয়ে সুনন্দার মুখ দেখল। মুখের ভাঁজে ভাঁজে পুরনোদিনের স্মৃতির ছায়াপাত অনুভব করতে চাইল। তারপর যথেষ্ট রাগত সুরে বলল, 'আচ্ছা অসভ্য ছেলে তো!'

সুনন্দা পরম যত্নে, যেন একটি শিশুকেই আদর করছে এমন ভঙ্গিতে সেই কাটাদাগটুকুর উপর আঙুল ঘষতে ঘষতে হেসে ফেলল ঝর ঝর করে, 'ইস, তোমার যে খুব রাগ দেখছি!'

সেই বিস্তৃত শব্দময় হাসির দিকে অপলকে তাকিয়ে সোমনাথ হঠাৎ আবার বুকের মধ্যে কষ্ট বোধ করল। সুনন্দার লাবণ্যহীন মুখ, শক্ত চোয়াল, চুল-ওঠা চওড়া কপাল, ঘাড় গলার ভাঁজে ভাঁজে ধুলো ঘাম, মরা ঘামাচি……

সোমনাথ মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিয়ে বলল, 'তুমি এখনও একা সুনন্দা, খুব একা……'

সুনন্দা হাসিমুখে কি যেন বলতে যাচ্ছিল ঠিক তখুনি অনেক মানুষের একটা মিছিল দ্রুত পদে কাছে পৌঁছে গেল এবং ক্রমশ তাদের অতিক্রম করে ময়দানের বুকের দিকে এগুতে লাগল। শব্দে শব্দে স্থানটুকু কেঁপে উঠল, পায়ে পায়ে ধুলো উড়তে লাগল, হাতে হাতে নানা রঙের ফ্ল্যাগ ফেস্টুন সূর্যাস্তের রঙে ঝলমলিয়ে সোমনাথ ও সুনন্দার মুখের উপর বিচিত্র বর্ণ-সমারোহে চমৎকার প্রতিফলিত হতে থাকল……

•

এবং সুহাসবাবু ঠিক এইখানে এসেই আপনার লেখার সমস্ত অংশটা কুৎসিত কদাকার হয়ে গেল। যেন একটি সুন্দর সুদৃশ্য ফুলের বাগানে একপাল শুয়োর এসে ঢুকে পড়ল কিংবা দুধের মতো ধবধবে সাদা চাদরের

উপর দিয়ে সারি সারি কিছু ছারপোকা কি আরশোলা হেঁটে গেল। অথচ সুহাসবাবু, গোড়ার দিকটা আপনি খুব যত্নে, যথেষ্ট সূক্ষ্মতায় চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছিলেন! সুনন্দার গালের কাটাদাগটুকুর দিকে তাকিয়ে সোমনাথের ভয়-ভাবনা বেদনাবোধ, একটি দুষ্টু ছেলের প্রসঙ্গে সোমনাথের রাগ ঈর্ষা এবং সুনন্দার অবদমিত মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা, তার ঝর-ঝর হাসির অন্তরালে নির্জন একাকীত্বের অন্তর্লীন বিষণ্ণতা……এসবকিছুই আপনার তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ-শক্তি ও চরিত্রনির্মাণক্ষমতার প্রমাণ দেয়। কিন্তু হঠাৎ এসবের মাঝখানে ধাবমান মিছিল কেন সুহাসবাবু? আপনি কি বলতে চাইছেন? কি বোঝাতে চাইছেন? ভালবাসা বস্তুটা এখন নির্জনতা ছেড়ে জনতার মিছিলে নেমে এসেছে? খাদ্য দাও, বোনাস দাও, দাম কমাও, এইসব তুচ্ছ কোলাহলের মধ্যেই এখন ব্যর্থ প্রেমের প্রতিষ্ঠা? সুনন্দা কিংবা সোমনাথ একা হয়েও একা নয়, তাদের কোনো একাকীত্বের বেদনাই নেই, সহস্র মানুষের ভিড়ের মধ্যে ভিড়ের মানুষ হয়ে মিশে আছে তারা? সুহাসবাবু, আপনার কথা আমরা ঠিক ধরতে পারছি না। আপনিও যে পেরেছেন এমন মনে হয় না। আসলে ঝোঁকের মাথায় কতগুলো শব্দ, কতগুলো চিত্র টেনে এনেছেন। একটি সুন্দর ছবির উপর অকারণে কিছু বাড়তি রং চাপিয়ে গোটা ছবিটাই নষ্ট করে দিয়েছেন।

দেখুন সুহাসবাবু, আজকাল মানুষ এমনিতেই ক্লান্ত, বড়ো বেশী ক্লান্ত। চাল ডাল তেল নুনের দৈনন্দিন সমস্যা—সে তো আছেই, তার উপরে আছে শব্দের কোলাহল, ঠাসাঠাসি-ভিড়ের কদর্যতা, চলাফেরায় শ্বাসটানার কষ্ট! মানুষ এখন আর মানুষকে একটুও সহ্য করতে পারে না, একটুও ভালবাসে না। একে অপরকে হিংস্র জন্তুর মতোই ভয় করে, ঘৃণা করে, আক্রমণ করে। এখন মানুষ মানুষের কাছে থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরে থাকতে চায়। সন্দেহ ঈর্ষা ঘৃণা ও আক্রমণের বিষবাষ্পের মধ্যে শ্বাসরুদ্ধ মানুষের ইদানীং-এর সাধনাই হল নির্জনতার সাধনা, একাকীত্বের সাধনা! আধুনিক মানবচরিত্রের এই জটিল রহস্য, এই গূঢ় ইচ্ছার তাৎপর্য আপনাকে বুঝতে হবে সুহাসবাবু। উপর-উপর দেখে কাজ করলে তো চলবে না! সহস্র ভিড়ের মধ্যেও মানুষ যে একা, একেবারে নিঃসঙ্গ নিঃসীম একা, সে যে কারো সম্পত্তি নয়, না সমাজের, না সংসারের, সে তার হৃদ্‌পিণ্ড নিয়ে, ফুসফুস নিয়ে, মগজ এবং আত্মা নিয়ে শুধুমাত্র যে তার নিজেরই—এই একক অখণ্ড স্বয়ংসম্পূর্ণ মানুষকে আবিষ্কার করাই যথার্থ শিল্পীর কাজ, সৎ-শিল্পের মহৎ দায়িত্ব সুহাসবাবু। ভিড়ের

মধ্যে মিশে-যাওয়া মানুষ—সে তো তালগোল পাকানো একটা কিস্তুত কিছুর প্রাণহীন যন্ত্রবৎ অংশমাত্র। সে তো মব, কিংবা ক্রাউড, তাকে ইচ্ছেমতো ব্যবহার করে রাজনীতির কাজ চলতে পারে, শিল্পসৃষ্টির কাজ চলে কি ?

সুহাসবাবু, রাগ করবেন না, আপনি তরুণ লেখক। আপনার সম্ভাবনা আছে, ভবিষ্যৎ আছে। আপনি আমার কথাগুলো নিয়ে ভাবুন, গভীর-ভাবে ভাবুন। তখন নিজেই বুঝবেন, আপনি দিক্‌ভ্রষ্ট হয়েছেন। সাহিত্যের নিত্যবস্তুকে ছেড়ে, নিত্যসৌন্দর্যকে অবজ্ঞা করে আপনি এক শব্দময় কোলাহল-সর্বস্বতার জগতে নিক্ষিপ্ত হতে চলেছেন, সেখানে উত্তেজনা থাকলেও শিল্পীর শাশ্বত আশ্রয় নেই সুহাসবাবু !

এবং এই কারণেই বলি, বন্ধুর মতো অগ্রজের মতো বলি, আপনার গল্পের পাত্রপাত্রীকে কদর্য কোলাহল থেকে মুক্তি দিন। ভালবাসার চালচিত্র থেকে কৃত্রিম রংগুলো পাল্টে ফেলুন, সংলাপগুলো ছেঁটে দিন, ভাষা ও শব্দকে নমনীয় করে আনুন। সবকিছুকে সময়ের সঙ্গে মিলিয়ে সহজ আর স্বাভাবিক করে তুলুন। এই ধরুন না কেন, আপনি লিখেছেন :

> মিটিং শুরু হতেই সোমনাথ বলল, 'চল একটু এগিয়ে যাই।'
>
> সুনন্দা ঘাড় কাৎ করল, 'চল।'
>
> ঘাসহীন ময়দানের শক্ত মাটিতে পা ফেলে পা ফেলে দু' পাশের ভিড়ের মধ্য দিয়ে দু'জনে এগুতে লাগল। কখনো ধাক্কা খেয়ে সুনন্দার শরীরে সোমনাথের শরীর ঠেকল, পায়ে পা জড়িয়ে গেল, হাতে হাতে ছোঁয়াছুঁয়ি হল। সোমনাথ হাসল। সুনন্দা গম্ভীর। হাসি ও গাম্ভীর্যের পথ বেয়ে ওদের সঙ্গে পাশাপাশি বহু পুরনো স্মৃতিও ভিড় মাড়িয়ে পায়ে পায়ে হাঁটতে লাগল।
>
> কিছুদূর গিয়ে আর পথ পাওয়া যায় না। সুনন্দা চোখ তুলে তাকাল সোমনাথের দিকে, 'কত মানুষ দেখেছ, সোম ?'
>
> সোমনাথ খুশির গলায় বলল, 'হাঁ, মানুষের মেলা বসে গেছে। রাগে দুঃখে মানুষ টগবগ করে ফুটছে।'
>
> 'এ রকম ফুটন্ত মানুষ দেখতেও ভাল লাগে।'
>
> 'ফুটন্ত মানুষ ? ভারি সুন্দর বলেছো তো !'
>
> 'বলব না কেন, আমি কি কথা বলতে ভুলে গেছি ?'
>
> 'না-না, তা কেন ! আমি জানি সুনু, তুমি একদিন গান গাইতে, আবৃত্তি করতে—'
>
> এবার সুনন্দা ভুরু টান করে হাসল, 'তাই নাকি ? মনে রেখেছ ?'

না, সুহাসবাবু, এভাবে নয়। এভাবে পিণ্ডাকার মানুষের গাদায়,

মাইকের বীভৎস চিৎকারের মধ্যে পুরনো দিনের গানের সুর টেনে আনবেন না সুহাসবাবু! অতিক্রান্ত-প্রায় যৌবনের দুটি ঘনিষ্ঠ মানুষকে ঘাসহীন ময়দানের শক্ত মাটি মাড়িয়ে যেতে দেবেন না, ধাক্কাধাক্কিতে শরীর ঠেকিয়ে কৃত্রিম রোমাঞ্চ জাগাবেন না! এর চেয়ে নিষ্ঠুর কাজ আর কিছু নেই! প্রেমের নামে আসলে এতো প্রেমের উপর ধর্ষণ সুহাসবাবু! সুনন্দা আর সোমনাথকে আপনি তার হাত থেকে রক্ষা করুন! তাদের জন্য একটু শান্ত নিরিবিলি জায়গা বেছে দিন, পায়ের তলায় একটু নরম মাটি, একটু সবুজ ঘাস দিন, সামনে তৃষ্ণার জলভরা টলটলে একটি নদী কিংবা জলাশয় দিন, একটু নির্মেঘ নীল আকাশ, দু'একটা পাখিপাখালির ওড়াওড়ি, একটু স্নিগ্ধ ক্লান্তি-জুড়ানো বাতাস দিন। বহুদিন পরে ওরা সবুজ ঘাসে পা মেলে দিয়ে একটু বসুক, গভীর নীচু গলায় একটু আলাপ করুক, স্বেচ্ছায় হাতের মুঠিতে হাত তুলে নিক, মুখের কাছে মুখ নিবিড় করে আনুক—

সুহাসবাবু, এটাই কি স্বাভাবিক নয়? আকাঙ্ক্ষিত নয়? এইসময় মানুষ আর মানুষের ভিড় কি ওদের ভাল লাগে? ভাল লাগা সম্ভব? বরং সুহাসবাবু আপনি আপনার সংলাপকে এইভাবে পাল্টে নিন

'এখানে একটাও মানুষ নেই, দেখেছ সোম?'
'হ্যাঁ, মানুষ থাকলেই বিচ্ছিরি লাগে।'
'আমারও।'
'অথচ দেখো, চারদিকেই মানুষ, গিজগিজ করছে মানুষে।'
'শুয়োরের মতো বংশবৃদ্ধি হলে এ রকমই হয়!'
'ওরা কথা বলতে দেয় না'
'কথা শুনতে দেয় না।'
'আর এমন কুৎসিতভাবে তাকিয়ে থাকে, যেন—'
'যেন এই খোলামাঠেই আমরা দর্শনীয় কিছু করে ফেলব, আর ওরা চোখ ভরে দেখতে পাবে!'

বলতে বলতে সোমনাথ সুনন্দার হাতের উপর মৃদু চাপ দেয়। সুনন্দা রাগের ভঙ্গিতে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, 'ধেৎ, তুমিও কিছু কম অসভ্য নও! বয়স হলে কি হবে, স্বভাব পাল্টায় নি! কতদিন পরে দেখা—'

সোমনাথ গম্ভীর হবার ভান করে, 'ঠিকই তো! কতদিন পরে দেখা! তুমি তাহলে বরং এখানে, এই নির্জনে, একটা গান গাও—'

না, সুহাসবাবু, ঠিক এইভাবেই যে আপনাকে লিখতে হবে এমন নয়। আমরা জোর করে আপনার উপর কিছু চাপিয়ে দিতে চাই না। শিল্পীর

স্বাধীনতায় আমরা বিশ্বাস করি! শিল্পকে আমরা অন্য নিরপেক্ষ স্বাধীন স্বতঃস্ফূর্ত মননকর্ম বলে শ্রদ্ধা করি। আপনি আপনার মতো লিখুন। আপনার বোধ, আবেগ, প্রেরণা নিয়ে লিখুন। কিন্তু সুহাসবাবু, রক্তমাংসের মানুষ গড়ুন, রক্তমাংসের ছবি আঁকুন। প্রেমকে প্রেম বলুন, কামকে কাম বলুন, রতিকে এনে প্রেমের আরতি সম্পূর্ণ করুন। বাকি যা কিছু অবাস্তব. অবাস্তব, তাকে ছেঁটে দিন, ঝেড়ে ফেলুন, মুক্ত করুন, মুক্ত হোন!

সুহাসবাবু, একালের নিঃসঙ্গ মানুষ তার একাকীত্বের যন্ত্রণা নিয়ে শুধু প্রেমেই আশ্রয় পেতে পারে। তার শেষ আশ্রয়। ডাঙায় তাড়িত হাঁস যেমন জলে গিয়ে ডুব দেয়, দগ্ধ ক্লান্ত বিচ্ছিন্ন মানুষও তেমনি প্রেমে এসে আকণ্ঠ সান্ত্বনা পায়। কিন্তু সুহাসবাবু, সে কোন্ প্রেম? তার রূপ আপনি যেভাবে ফোটাতে চেয়েছেন, অবিকল কি তা-ই? একে কি প্রেম বলে কিংবা প্রেমের রোমন্থন? গাঁয়ের মজে-যাওয়া পুকুর দেখেছেন সুহাসবাবু? সেখানে কাদা ঘেঁটে, জল ছিটিয়ে এক দঙ্গল ন্যাংটা বাচ্চা হৈ হৈ করে মাছ খুঁজে বেড়ায়—আপনিও তো সেইভাবে থিক-থিক-করা একপাল মানুষের ভিড়ে প্রেম খুঁজছেন সুহাসবাবু! তাও কিনা আবার উত্তীর্ণ-যৌবনের স্মৃতিসম্বল প্রেম! প্রেমের এমন কর্দমাক্ত রূপ আপনার নিজের চোখেই কি ভাল লাগছে? পড়ুন, আর একবার পড়ে দেখুন তো লেখাটা:

> অন্ধকারে শব্দগুলো কাঁপছে। অন্ধকারে মানুষের শরীরগুলো কাঁপছে। এখানে ওখানে ফেরিওলার বাতিগুলো স্থির অকম্প হয়ে জ্বলছে। লক্ষ মানুষের নিঃশ্বাসে উত্তপ্ত ময়দানের বাতাস মাথার উপর থমকে আছে। সোমনাথ এখন সুনন্দার অনেক কাছে, গা ঘেষে দাঁড়িয়ে আছে। সুনন্দা তার খোলা ঘাড়ের উপর সোমনাথের গভীর নিঃশ্বাস পতনের শব্দ অনুভব করছে। সোমনাথ সুনন্দার চুল-থেকে-উঠে-আসা নারকেল তেলের গন্ধ পাচ্ছে। শব্দ গন্ধ ও স্পর্শের বৃত্তে দুটো মানুষ পরস্পর সংলগ্ন দুটি বৃক্ষের মতো ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই মুহূর্তে তারা কোনো কথা বলছে না অথচ তাদের চারদিকে বিরামহীন কথা শব্দ চিৎকার টুকরো-টুকরো হাসি রাগ উত্তেজনা খেলা করছে। এই মুহূর্তে তারা কি কিছু ভাবছে? কোনো পুরনো সুর, ছিন্ন গানের কথা? ঘরবাঁধার কোনো নির্মল প্রতিশ্রুতি অথবা ঘরভাঙার কোনো দুঃসহ বেদনার কথা?
>
> কিংবা এসব নয়, পরিবর্তে এই মুহূর্তে সুনন্দার মনে পড়ছে, তার ভাইটা আজ সাতবছর জেলে, এই জনসমুদ্র কি মুক্ত করে আনতে পারবে তাকে?

সোমনাথের মনে পড়ছে, 'অবাধ্যতা'র জন্য তার মাথার উপর সাসপেনসনের নোটিশ ঝুলছে। আজকের দলবদ্ধ এত মানুষ কি জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা এনে দিতে পারবে তাকে?

অথবা কিছুই ভাবছে না তারা, কিছুই শুনছে না। পরস্পর-সংলগ্ন বৃক্ষের মতো বিশাল জনঅরণ্যে দাঁড়িয়ে থেকে একে শুধু অপরের উত্তাপ টানছে, ঘ্রাণ নিচ্ছে, স্পর্শ পাচ্ছে। কেননা এখন, এই মুহূর্তে, সমস্ত ক্লান্তি মুছে গিয়ে উভয়ের মুখেই কেমন একটা আবেশের চিহ্ন ফুটে উঠেছে। সুখ অথচ সুখ নয়, দুঃখ অথচ দুঃখ নয়। সুখে-দুঃখে জড়িয়ে একটা কিছু, বিষণ্ণ কিন্তু উজ্জ্বল, যেন রুক্ষ মাঠের বিবর্ণ ফসল শীতের শিশিরে ভিজে প্রফুল্ল হয়েছে……

না, সুহাসবাবু হয় নি। বিবর্ণ ফসল শিশিরে ভিজে প্রফুল্ল হয় না কোনোদিন। একটু পরেই কড়া রোদ এসে তাকে আরো বিবর্ণ করে তোলে। সে মরে না কিন্তু বড়ো করুণভাবে ধুঁকতে ধুঁকতে বাঁচে। এই মৃত বিবর্ণতার মধ্যে আপনি কেন সুখ খুঁজছেন সুহাসবাবু? যৌবনের সুখ, প্রণয়ের সুখ? সুখ কি এত সহজ? এত অনায়াস লভ্য? আর এসবের সঙ্গে কয়েকবারই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সুনন্দার কোনো-এক জেলবন্দী ভাই আর সোমনাথের সাসপেনসনের নোটিশকেই বা কেন জড়ো করেছেন এনে? ভালবাসার চালচিত্রে এসব রাজনৈতিক ইঙ্গিতের কি প্রয়োজন? কাদা ছেঁচে মাছ ধরতে গিয়ে আপনি যে সাপের বাচ্চাও ধরে আনছেন সুহাসবাবু! এ তো বড়ো সাংঘাতিক

আপনি গাছের সঙ্গে উপমা দিচ্ছিলেন না? আনুন না, গাছের মতোই আনুন ওদের। পরিপুষ্ট নগ্ন নিরাবরণ বৃক্ষ, তার শিকড়বাকড় ছড়িয়ে থাক অন্ধকারে মাটির নীচে, সে তার শরীরের উজ্জ্বলতা নিয়ে মসৃণতা নিয়ে আমাদের কাছে উদ্ভাসিত হোক। সুহাসবাবু, প্রকৃতির রাজ্যে কোনো গোপনতা থাকে না, প্রণয়ের রাজ্যেই বা এত ফিসফাস, ঢাকাঢাকি, আড়া-আড়ি কেন? শরীর ছাড়া তো কোনো-কিছুরই আশ্রয় নেই! রক্তমাংস বাদ দিলে সবই তো উদ্বাস্তু! সুহাসবাবু, মানুষ নয়, মানুষের শরীর নিয়ে খেলতে শিখুন, সপ্ত তার বীণার মতো শরীরকে বাজিয়ে তুলুন। শুধু ঘাড়ের উপর নিঃশ্বাসের অনুভব কিংবা চুলের গোছার একটু তেলের গন্ধে পাঠককে প্রতারিত করবেন না। নিঃশ্বাসকে ঘন, গন্ধকে নিবিড়, স্পর্শকে উত্তপ্ত করে তুলুন। মন যদি মনের কাছে ভালবাসা মেলে ধরতে চায়, তাহলে শরীরও শরীরের কাছে নিজেকে উন্মুক্ত করুক। উভয়ের এই শরীর-উন্মোচনের মিলিত নামই তো প্রেম, সুহাসবাবু!

বিশেষত আপনার নায়কনায়িকা যখন প্রায় প্রৌঢ়ই, তখন এত সঙ্কোচ কেন? কোনো নির্জন স্থানে তাদের খুশিমতো খেলতে দিন, হাত পা ছড়াতে দিন তারা প্রসারিত হোক, নিরাবরণ হোক, পরিপূর্ণ হোক! ঘোলা কাদার মাছকে আপনি সমুদ্রশয্যা দিন, অন্তত তাদের নদীর মাছ করে তুলুন! ওদের বয়সটাই যে এখন গভীরে খেলবার বয়স, সুহাসবাবু!

এবং এইভাবে নতুন করে সাজালে আপনার গল্পের উপসংহারটাও পাল্টে যাবে। এখন যেমন আছে:

> মিটিঙের শেষে সারা মাঠ জুড়ে শব্দের তোলপাড় ঝড় উঠল। কারা যেন মুঠিতে কাগজ পাকিয়ে আগুন জ্বালাল। মশালের মতো আগুন অন্ধকারে উঁচু হয়ে দপদপিয়ে উঠল। আকাশ থেকে তারাগুলো ঝুঁকে নামল। বাতাস জোরে বইতে লাগল। ক্রমে সারা মাঠ প্রজ্বলন্ত আগুন হয়ে গেল। সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো উপরে-নীচে সবত্র আগুনের উথাল-পাথাল খেলা চলতে লাগল। সোমনাথ দেখল, সুনন্দার মুখ উজ্জ্বল আলোতে টকটক করছে। চোখের দৃষ্টিতে উত্তেজনা থর থর করে কাঁপছে। দ্রুত নিঃশ্বাসে বুক উঠানামা করছে। সুনন্দা অবাক হয়ে অন্ধকার আকাশের নীচে আগুনের খেলা দেখছে। সোমনাথ সুনন্দার মুখ দেখছে……
>
> প্রবল শব্দ-কোলাহলের মধ্যে সুনন্দা একসময় চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'দেখ, দেখ, ওই দিকটায় দেখ—'
>
> সোমনাথ চোখ ফেরাল না, স্থিরদৃষ্টিতে সুনন্দার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'দেখছি তো! অনেকক্ষণ থেকে দেখছি!'
>
> 'ছাই দেখছ!' বলে সুনন্দা হঠাৎ যেন লজ্জা পেয়ে মুখ নীচু করল। আর সোমনাথ তখুনি প্রথম-চুম্বিতা কিশোরীর গালের মতো সুনন্দার লজ্জাজড়ানো মুখ দেখে ভরাট গলায় হেসে উঠল হা হা করে। যেন কতদিন পরে, কতযুগ পরে সে এইভাবে হাসতে পারল! ঘর-ফেরা সহস্র মানুষের তোলপাড় শব্দে ভর দিয়ে সেই হাসিটা কিছুদূর হেঁটে গেল, তারপর ঊর্ধ্বে উঠে আগুনের শিখায় আগুন হয়ে মিশে গিয়ে বাতাসে কাঁপতে লাগল।

সুহাসবাবু এটা তো উপসংহার নয়, সংহার। নির্মম হাতে গলা টিপে খুন করা। আপনারই দেওয়া উপমায় যারা কিনা বৃক্ষের মতো আকাশে ছড়িয়ে পড়তে পারত, নদীর মতো সমুদ্রে যেতে পারত কিংবা আর কিছু না পারুক একজন আর একজনের শরীরের গভীরে ডুব দিয়ে কিছু মণি-মুক্তাও তুলে আনতে পারত—তাদের কিনা সস্তা রাজনীতির মেঠো আগুনে দগ্ধ করে বানালেন শ্মশানের পোড়াকাঠ! আপনার নায়কের শেষ হাসি

আসলে তো বিদ্রূপেরই হাসি, স্রষ্টার প্রতি সৃষ্টির বিদ্রূপ, আপনি বোঝেন নি সুহাসবাবু ?

অথচ এই গল্পের শেষটুকু অশেষের ব্যঞ্জনা নিয়ে কি চমৎকারই না হতে পারত! ধরুন, শৈলশিখরচূড়ায় হোটেলের কোনো নিরিবিলি ঘর, দীঘার সমুদ্র সৈকত. সুন্দরবনের দীর্ঘ অরণ্যের ছায়ায় বয়ে-যাওয়া কোনো নদী কিংবা নদীর বুকে নোঙর ফেলা কোনো মোটর লঞ্চ, অন্তত কলকাতার বুকেই নির্জন গঙ্গার তীর……

স্মৃতির বুক বেয়ে উঠে-আসা দুটি মানুষ কাছাকাছি বসে আছে, সব কথার শেষে এখন নিঃশব্দ। সামনে অন্ধকারে প্রসারিত গঙ্গা, গঙ্গার জলে তারার ছায়া ঢেউয়ে ভাঙছে, দূরে নৌকায় মাঝিদের আলো জোনাকির মতো জ্বলছে। অস্পষ্ট অন্ধকারে কেউ কারো মুখ দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু দু'জনের বুকেই একটা উত্তাপ গলে গলে পড়ছে, একটা উদ্দাম ঝড় ওঠানামা করছে. যেন দুটো দেহ নিম্নমুখ পতনের চূড়ায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে আবেগে কাঁপছে।

এইসময় সহসা তোলপাড় শব্দে গঙ্গার বুকে একটা জাহাজ ছুটে এল। দূর থেকেও তার আলো এসে পড়ল সুনন্দার শরীরে। নির্জন অন্ধকারের পটভূমিতে সুনন্দার সমস্ত শরীর যেন অলজ্জিতা অপ্সরীর মতো উদ্ভাসিত হল। সোমনাথ আবেগে বলে উঠল, 'তোমাকে চমৎকার দেখাচ্ছে সুনন্দা, ঠিক যেন এক কিশোরী……'

সুনন্দা কথা বলল না, কিশোরীর মতই চপল ভ্রূভঙ্গে সোমনাথকে বিদ্ধ করে অল্প হাসল।

সেই হাসি সোমনাথকে আরো বিপর্যস্ত করল। সে সহসা হাত বাড়িয়ে সুনন্দার একটা হাত গভীর আশ্লেষে জড়িয়ে ধরল।

জাহাজের আলো ততক্ষণে মুখ ঘুরিয়েছে।

এখন এখানে উজ্জ্বল আরক্ত অন্ধকার!

সুহাসবাবু, গল্পটা এভাবে শেষ হয় না?

না, ক্ষুণ্ণ হবেন না। আগেই তো বলেছি. আপনার উপর আমরা কিছু চাপিয়ে দিচ্ছি না, কেন না. শিল্পীর স্বাধীনতায় আমরা বিশ্বাস করি। আপনি ভাবুন. নিজে থেকেই ভাবুন। ভেবে-চিন্তে নতুন গল্প নিয়ে আমাদের কাছে আসুন!

আপনাকে সাহায্য করার জন্য আমরা সবসময় প্রস্তুত হয়েই আছি সুহাসবাবু!

৬ একটি প্রাপ্ত-বয়স্ক গল্প

একটি সাইনবোর্ডের জন্য চক্রধরপুর বহুমুখী বিদ্যালয়ের হেড্‌মাস্টার জনার্দনবাবুর চাকরি যাবার উপক্রম হ'ল। এ প্রায় বছর চারেক আগের কথা। আমিও তখন ওই স্কুলে কাজ করছি। পশ্চিম বাংলার সীমান্ত অঞ্চলে বিহারের গা ঘেঁষে চক্রধরপুর। গ্রাম হলেও বেশ বর্ধিষ্ণু জায়গা। হেলথ সেন্টার, বি-ডি-ও অফিস, গোটা দুই ধানকল—এসব তো আছেই, অস্থায়ী তাঁবুর একটা সিনেমা পর্যন্ত আছে। সদর শহর মাত্র দশ মাইল দূরে। স্কুলের পাশ দিয়ে সাত আট বার বাস যায়। স্কুলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা খুব কম নয়, পাঁচশ'র কাছাকাছি।

হেড্‌মাস্টার জনার্দন ঘোষাল প্রবীণ লোক। পঞ্চাশ পার হয়েছে। কালো রং, বেঁটে গড়ন, হাত পায়ের হাড়গুলো চওড়া-চওড়া। বেশ বড়ো গোলাকৃতি মুখে চোয়ালের হাড় দুটো উঁচু হয়ে থাকায় সবসময় কেমন রাগী রাগী মনে হয়। আসলে খুব মিশুকে মানুষ। কথা বলেন প্রচুর, চেঁচিয়ে হাসেন, খেতে ও খাওয়াতে ভালবাসেন। তাঁর কোয়ার্টারে গ্রামের মানুষ ও শিক্ষকদের অবারিত দ্বার।

আবার একরোখা, একগুঁয়ে বলেও তাঁর একটু বদনাম আছে। একবার কোনো কিছু মগজে ঢুকলে তাড়ানো মুস্কিল। তখন নিজের যুক্তি ছাড়া আর কিছু মানেন না। গোলগাল মুখের পেশীগুলি শক্ত করে ক্রমাগত মাথা নাড়তে থাকেন। যার অর্থ, 'কোনো লাভ নেই, আই শ্যাল নেভার বি কনভিন্সড্‌। যা বুঝেছি, ঠিকই বুঝেছি!'

জনার্দনবাবুর এই একগুঁয়েমির সঙ্গে হাসিখুশি সরল ভাবটা যদি না থাকত তাহলে কবেই তাঁর চাকরি যেত। স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি তাঁকে নিয়ে খুব সুখী নয়, কিন্তু তাঁকে তাড়ানোর চেষ্টাও করে না। বছর দশেক আগে এই স্কুলটা অর্থ ও ছাত্রাভাবে যখন উঠে যায় যায়, তখন তিনি এসেছিলেন। ক্লাস টেনের স্কুল ছিল তখন। তারপর বলা যায়, অক্লান্ত পরিশ্রমে অসাধ্য

সাধন করেছেন জনার্দনবাবু। গ্রামে গ্রামে ঘুরে ছাত্র সংগ্রহ করেছেন, চাঁদা আদায় করেছেন, ধান চাল তুলেছেন। সদরে ডি-আই-এর অফিসে ধর্ণা দিয়ে, রাইটার্স বিল্ডিং-এর শিক্ষা দপ্তরে একরকম অবস্থান ধর্মঘট চালিয়ে নানারকমের গ্র্যান্ট আদায় করেছেন, টিনের ঘর ভেঙে নতুন পাকাবাড়ী করেছেন. হোস্টেল করেছেন, মাস্টারদের তিনজোড়া কোয়ার্টার বানিয়েছেন। একটা হাইস্কুলকে এইভাবে তিনি সহশিক্ষামূলক বহুমুখী বিদ্যালয়ে পরিণত করেছেন। এতসব করেও ক্লান্ত হননি জনার্দনবাবু. পাশাপাশি তিনি প্রাইভেটে আরো একটা এম-এ পাশ করেছেন, গ্রামে স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করেছেন, একটা জুনিয়র গার্লস স্কুলের অনুমতি আদায় করেছেন. প্রাক্তন ছাত্রদের উৎসাহ দিয়ে একটা লাইব্রেরী বানিয়েছেন, অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে, গ্রামবাসীদের সইসাবুদ জড়ো করে ব্লক ডেভেলাপমেন্টের অফিস এই অঞ্চলেই বসিয়েছেন।

সব ব্যাপারে তাঁর এমন উৎসাহ অনেকের চোখেই ভাল ঠেকেনি। স্কুলের সেক্রেটারি নিত্যানন্দ মাইতি তো কিছুদিন প্রকাশ্যেই বলতেন, 'এবার হেড্ মাস্টার ভোটে নামবে। দেখো তোমরা—' ভয়টা তাঁরই বেশী ছিল। কারণ তাঁর ছোটমামা, পাশের গাঁয়ে যার পৈতৃক ভিটা অথচ যিনি বারোমাস কলিকাতা প্রবাসী, সরিষার তৈল ও ঘৃতের ব্যবসাদার, নির্বাচনের সময় এই অঞ্চল থেকেই বিপুল ভোটাধিক্যে জয়যুক্ত হন। একবার তিনি নাকি ভাগিনেয়কে একটি চিঠিতে লিখেও ছিলেন, 'তোমাদের হেড্মাস্টারটিকে আমার সৎলোক বলিয়া বোধ হইতেছে না। উহার নিশ্চয়ই কিছু গুরুতর মতলব রহিয়াছে। তুমি অবস্থা বুঝিয়া উহাকে বিদায় দিবার ব্যবস্থা করিবে।'

কিন্তু ততদিনে সাধারণ গ্রামবাসীর মনে হেড্মাস্টারের শিকড় অনেক দূর ছড়িয়েছে। চট্ করে কিছু করা মুস্কিল। বদলির চাকরি নয় যে উপর থেকে কলকব্জা নাড়া চলবে। নিত্যানন্দ মাইতি খুব মনোযোগে জনার্দন-বাবুর চালচলন লক্ষ্য করতে লাগলেন। শেষপর্যন্ত মোটামুটি আশ্বস্তও হলেন। না, রাজনীতির দিকে তেমন ঝোঁক নেই লোকটার। গাঁয়ের চাষাভূষোদের মধ্যে মাঝে মাঝে ঘুরে বেড়ান বটে কিন্তু সেটা স্কুলের স্বার্থেই। লেখাপড়ার বাইরে বড়ো একটা কথা বলেন না। এমন কি, গাঁয়ের ছোটো-খাটো সভাসমিতিতে নিত্যানন্দ যখন সগর্বে ঘোষণা করেন, এই স্কুল, হাসপাতাল, বি-ডি-ও অফিস সবই হয়েছে তাঁর ছোটমামার জন্য, এসবকিছুই গ্রামের প্রতি ছোটমামার অকৃত্রিম ভালবাসা ও নিঃস্বার্থ সেবার জলন্ত

নিদর্শন, তখনও হেড্‌মাস্টার প্রতিবাদ করেন না! খুব খুঁটিয়ে দেখেছেন নিত্যানন্দ, জনার্দনবাবুর কালো মোটা ঠোঁট দুটোতে সামান্যতম বাঁকা হাসির রেখাও ফুটে ওঠে না! কাজেই এখুনি দুশ্চিন্তার কিছু নেই। নিত্যানন্দ নাকি খুশি মনেই ছোটমামাকে জানিয়েছেন, 'লোকটাকে তত খারাপ বলিয়া বোধ হইতেছে না। তথাপি আমি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেছি। তেমন কিছু বুঝিলে পত্রপাঠ বিদায় করিব।'

আমি স্কুলে ঢুকে ক্রমে ক্রমে এসব জেনেছি। আর যত জেনেছি মানুষটার প্রতি শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ ততই বেড়েছে। আবার রাগও হয়েছে কখনো-সখনো। তাঁর পরিশ্রমের সমস্ত ফসল অন্যে আত্মসাৎ করছে অথচ তিনি প্রতিবাদহীন, নির্বিকার—এটা মুখ বুজে সহ্য করা যে-কোনো যুবকের পক্ষেই একটু কষ্টকর। টিচার্সরুমে এ নিয়ে মাঝে মাঝে আলোচনা হয়। নারায়ণবাবু পুরনো লোক। অঙ্কের শিক্ষক। রোজ আটমাইল দূর থেকে সাইকেলে করে আসেন। তিনি বলেন, 'কেন মশাই, আপনি সাহিত্যের লোক, সেই প্রবাদটা জানেন না? কেহ মরে বিল ছেঁচে কেহ খায় কই!'

আমি বলি, 'এ যে পুকুর শুদ্ধ গিলে ফেলা, নারায়ণবাবু!'

নারায়ণবাবু বলেন, 'যার ক্ষমতা আছে সে ত গিলবেই! অগস্ত্য শুনেছি সমুদ্র পর্যন্ত গিলে ফেলেছিল—'

এগ্রিকালচারের তেজেশবাবু বলেন, 'এত ভাল ভাল না নারায়ণবাবু। দেখবেন কাজকর্ম সব গুছানো হয়ে গেলে হেড্‌মাস্টারকে ওরা ঠিক তাড়াবে!'

আর হেড্‌মাস্টারমশাইকে এ বিষয়ে কিছু প্রশ্ন করলেই তিনি ঘন লাল রঙের লাইব্রেরী ফ্রেমের চশমাটা নাক থেকে নামিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। তারপর হাসতে হাসতে বলেন, 'আপনারা মশাই অর্বাচীন! গীতা পড়েন নি? মা ফলেষু কদাচন—'

স্কুলের উত্তরদিকে জনার্দনবাবুর কোয়ার্টার। ছোট একতলা বাড়ী। ছাদে ওঠার জন্য কাঠের সিঁড়ি আছে। সন্ধ্যার দিকে একটু ঘুরে ফিরে আমরা জনার্দনবাবুর বাড়ী যাই। গরমকালে ছাদে একটা মাদুর বিছিয়ে গল্পের আসর জমে ওঠে। জনার্দনবাবু নিঃসন্তান। তাঁর স্ত্রী বিমলা দেবী আমাদের সকলেরই বৌদি। ছেলেপুলে না হওয়ায় শরীরে সামান্য চর্বি জমেছে। লম্বা ও ফর্সা চেহারা বলে বাড়তি চর্বিটুকু খারাপ লাগে না। পড়াশুনা বিশেষ করেন নি. কিন্তু জনার্দনবাবুর সাহচর্যে থেকে অনেক কিছু শিখেছেন। তিনিও প্রায়ই গল্পের আসরে যোগ দেন। মাত্রা রেখে হাসি

ঠাট্টাও করেন। কথাবার্তায় বা ব্যবহারে অল্প আড়ষ্টতা থাকলেও কৃত্রিমতা থাকে না।

গ্রামে শিক্ষিত লোক বিশেষ নেই। সবাই চাকরির টানে বাইরে। বি-ডি-ও অফিস ও হেলথ-সেণ্টার হওয়ার ফলে এখন বাইরের লোক কিছু গ্রামে ঢুকেছে। আমরা অন্য কোথাও বড়ো একটা যাই না। সন্ধ্যা হলেই জনার্দনবাবুর বাড়ী চলে আসি। মাঝে মাঝে হেলথ-সেণ্টারের ডাক্তারবাবু আসেন, বি-ডি-ও সাহেবও আসেন। ওঁরা হেডমাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে নীচের ঘরে বসে আড্ডা দেন। আমাদের বিশেষ আমল দেন না।

ওঁরা চলে গেলে জনার্দনবাবু ছাদে উঠে এসে গায়ের গেঞ্জিটা খুলতে খুলতে বলেন, 'বাঁচা গেল মশাই, এতক্ষণ হিসেব করে কথা বলতে বলতে প্রাণান্ত। একজন ডাক্তার, আর একজন অফিসার···সব উঁচুদরের ব্যাপার। আমাদের পোষায় নাকি! বার্ডস অব দি সেম্ ফেদার না হলে কি আড্ডা হয় মশাই?'

তারপর পানের কৌটো খুলে একটা মুখে পুরতে পুরতে বলেন, 'কিগো, এদের চা-টা দিয়েছিলে ত? আর সেই কাঁঠালটা? ভাঙো নি?'

পাশের গাঁয়ের সমীরণ হেড্‌মাস্টার মশাইয়ের পুরনো ছাত্র। হালে একটা কাজ পেয়েছে। গতকাল চাকরিতে যোগ দিতে যাবার সময় গাছের একটি কাঁঠাল নামিয়ে দিয়ে গেছে। দৈর্ঘ্যে প্রস্থে বিশাল সেই কাঁঠালটি আমরা সবাই দেখেছি।

বিমলা বৌদি বললেন, 'ও কাঁঠাল আমি ভাঙতে পারব না। তোমরা সবাই মিলে ধরাধরি করে ছাদে এনে ভেঙে খাও—'

জনার্দনবাবু বললেন, 'শুনলেন মশাই, আপনাদের বৌদির কথা! আমরা কি শৃগাল-জাতীয় নাকি!'

বিমলা বৌদি সামান্য হাসলেন, 'তা কেন! শেয়ালেরা ত খুব ধূর্ত শুনেছি। তোমার ত বারো বছর মাস্টারী করা হয়ে গেছে— '

এবার আমরা সবাই হেসে উঠলাম। জনার্দনবাবুর হাসিটা সকলকে ছাপিয়ে দক্ষিণের খোলা প্রান্তরে ছড়িয়ে গেল। বিমলা বৌদি মুখে আঁচল চাপা দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। জনার্দনবাবু বহুকষ্টে বললেন, 'আমার জন্য আর ক'টা পানও নিয়ে এসো কিন্তু!'

জনার্দনবাবুর ছাদের উপর থেকে রেল স্টেশন দেখা যায় না। কিন্তু স্টেশনের পাশে ধানকল দুটোর কালো চিমনী দেখা যায়। তারই পাশে

অস্থায়ী তাঁবুর সিনেমা। একটু রাত হলে ডায়নামোর বিকট ভট্‌ভট্‌ শব্দ কানে আসে। হেড্‌মাস্টারমশাই বলেন, 'ওটা কবে উঠবে বল ত সুবিনয়? যত রাজ্যের হিন্দী বই এনে জড়ো করে, আর ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে তাই দেখতে যায়। পয়সা নষ্ট, স্বভাব নষ্ট!'

বিমলা বৌদি বলেন, 'যাবে না ত করবে কি। আর কি আছে গ্রামে। আমিও ভাবছি যাব একদিন—'

'যাবে? তুমি?' জনার্দনবাবু কপট-গাম্ভীর্যে বলেন, 'ঠিক আছে। তুমি ওই তাঁবুর মধ্যে বসে যদি সিনেমা দেখে আসতে পার তাহলে পরের দিনই আমি তোমাকে কৃষ্ণনগর নিয়ে যাব—'

কৃষ্ণনগর বিমলা বৌদির বাপের বাড়ী। বাবা জীবিত নেই। কিন্তু মা আছেন, ভাইরা আছে। আজ সাড়ে চার বছর নাকি বিমলা বৌদি কৃষ্ণনগর যান নি। ও-প্রসঙ্গ উঠতেই বৌদির মুখ ভার হয়ে গেল। বললেন, 'থাক, খুব হয়েছে!'

জনার্দনবাবু বললেন, 'না, আমি সত্যি বলছি। এই এঁরা সব সাক্ষী—'

বিমলা বৌদি বললেন, 'আর সাক্ষীসাবুদের দরকার নেই! এবার যেদিন ইচ্ছে হবে একাই বেরিয়ে পড়ব!'

'একাই! সর্বনাশ!' জনার্দনবাবু ঠোঁট টিপে হাসতে শুরু করলেন, 'এতগুলো লক্ষ্মণ দেওর থাকতে একা যাবে কোন্ দুঃখে! যাকে বলবে সেই নিয়ে যাবে তোমায়—'

'তবু তুমি যাবে না?'

'আমায় কে যেতে বলে? শালাবা লেখে কোনোদিন?'

'লেখে না? আনব চিঠিগুলি!'

'না, না, আনতে হবে না!' ধরা পড়ে মুখখানাকে অতিশয় নিরীহ করে তোলেন জনার্দনবাবু। হাসতে হাসতেই বলেন, 'তার চেয়ে তুমি বরং কিছু গরম লুচি ভেজে আনো গে।'

বিমলাবৌদি রাগ করে বলেন, কিছু আনব না। আজ সব বন্ধ!'

কিন্তু বন্ধ হয় না। একটু পরেই বিমলাবৌদি কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে যান। লুচি আসে, বেগুনভাজা আসে। চা-ও সময়মত। সে-সব কিছুর সঙ্গে এই প্রৌঢ়দম্পতির সরল মান অভিমান ও পরিহাসটুকু আমাদের কাছে রীতিমত উপভোগ্য মনে হয়। কোয়ার্টারে ফেরার পথে আমরা বলাবলি করি, জনার্দনবাবুর মত মানুষ হয় না। বিমলাবৌদির আন্তরিক

আতিথেয়তা একালে দুর্লভ। ঈর্ষাকুটিল, স্বার্থপর সংসারে এই দম্পতিটি যেন সুন্দর একটি মরুদ্যান। কোলকাতা থেকে অনেক দূরে নির্জন নিরিবিলি এই গণ্ডগ্রামে এমন সহৃদয় একজোড়া মানুষ না পেলে আমরা নিশ্চয়ই হাঁপিয়ে উঠতাম। সমস্ত সন্ধ্যাটা আমাদের কাছে বিস্বাদ হয়ে যেত।

আর এই সময়ই আমরা কেউ বলি, 'বিমলাবৌদির যদি একটা ছেলে-মেয়ে কিছু থাকত!'

একদিন বিমলাবৌদি আমায় ডেকে পাঠালেন। রাত তখন দশটা। শীতের রাত। চক্রধরপুর নিঝুম নিঃশব্দ। হোস্টেলের ছেলেরাও শুয়ে পড়েছে। চারিদিকে ঝিঁঝিঁ ডাকছে। নিমগাছে বাতাসের শব্দ উঠছে। মাথার উপর কৃষ্ণপক্ষের সরু চাঁদ।

আমিও শুয়ে পড়ার জন্য তৈরী হচ্ছিলাম। হেড্‌মাস্টারমশাইয়ের গৃহভৃত্য কুড়োরাম ডাকতে এল। সেদিন সন্ধ্যায় গল্পের আসর বসে নি। জনার্দনবাবু সদরে গিয়েছিলেন দুপুরে। সাড়ে আটটার বাসে ফেরার কথা।

আমি যেতেই বিমলাবৌদি বললেন, 'একবার স্কুলে যান বিনয়ঠাকুরপো।'

'স্কুলে? এত রাত্রে?'

'হ্যাঁ। দিনদুপুর হলে আর আপনাকে ডাকব কেন?'

'কি ব্যাপার?'

'আপনাদের মাস্টারমশাই ওখানেই রাত্রিবাস করতে গেছেন!'

বারান্দায় দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল। বিমলাবৌদির মুখ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম না। গলার স্বর ভারি ঠেকছিল। আমি খুব অবাক হলাম। শহর থেকে কখন ফিরলেন জনার্দনবাবু, কখনই বা খাওয়া দাওয়া করলেন। তারপর এমন কি ঘটল যে রাত্রিবাসের জন্য তাঁকে স্কুলের ঘর বেছে নিতে হ'ল। কিন্তু এ বিষয়ে এই মুহূর্তে বিমলাবৌদিকে জেরা করা উচিত হবে না মনে করে এবং ঘটনাটাকে বড়োরকমের একটা দাম্পত্য কলহের পরিণাম ভেবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখে স্কুলের দিকে রওনা হলাম।

বিমলাবৌদি ডেকে বললেন, 'জানেনই ত ওঁর জেদ। একেবারে বাচ্চা ছেলের মত! একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে যেন নিয়ে আসবেন ভাই!'

কিন্তু নিয়ে আসা কাজটা খুব সহজ নয়। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের যদি বাচ্চাদের মত বেপরোয়া জিদ থাকে তাহলে তাঁর সঙ্গে এঁটে ওঠা রীতিমত মুস্কিল! আমি স্কুলে পৌঁছে দেখলাম, হেড্‌মাস্টারের ঘরে আলো

জ্বলছে। দরজাটা ভেতর থেকে ভেজানো। সামান্য আলো বারান্দায় এসে পড়েছে। স্কুল-পাহারাদার সেই পরিচিত বেওয়ারিশ কুকুরটা দরজার পাশে চুপ করে শুয়ে আছে। ও-পাশের হেলথ্ সেণ্টারে বোধ হয় একজন রুগী এসেছে। কিছু লোকের গলা শোনা যাচ্ছে। ডাক্তারবাবুকে ডাকছে ওরা। কিন্তু ডাঃ তরফদারের কোনো সাড়া নেই।

আমি দরজার কাছে একমুহূর্ত দাঁড়ালাম। কুকুরটা মুখ তুলে লেজ নাড়ল ও শব্দ করে হাই তুলল। বারান্দার উপর দিয়ে একটা বাদুড় উড়ে গেল। সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে ভারি অদ্ভুত ও কৌতুককর মনে হল। একজন প্রবীণ মানুষ রাগারাগি করে স্কুলে স্বেচ্ছানির্বাসন নিয়েছেন, তিনি আবার আমাদেরই মাননীয় প্রধানশিক্ষক, আমি তাঁর অধীন কনিষ্ঠতম শিক্ষক গভীর শীতের রাতে তাঁর রাগ ভাঙাতে এসেছি। এই দৃশ্যটা স্কুলের ছেলেরা যদি দেখত!

দিনের বেলায় এই ঘরে ঢুকতে আমাদের রীতিমত ভাবনা হয়। কেননা স্কুল-আওয়ারে জনার্দনবাবুর অন্য মূর্তি। ছাত্র ও শিক্ষক উভয়ক্ষেত্রেই ডিসিপ্লিনের ব্যাপারে পান থেকে চুন খসবার উপায় নেই। তিনি নিজে সারাক্ষণ ঘুরে ঘুরে সব দেখেন। কোন্ ছেলেটা ক্লাসে না গিয়ে নিমতলায় ঘুরঘুর করছে, কোন্ মেয়েটা একটু সেজেগুজে চকচকে শাড়ী কিংবা ফ্রক পরে স্কুলে এসেছে, কোন্ মাস্টারমশাই ঘণ্টা পড়ার পাঁচ মিনিট পরেও ক্লাসে না গিয়ে টীচার্সরুমে বাসি খবরের কাগজের পাতা ওল্টাচ্ছেন—সবকিছু খুঁটিয়ে লক্ষ্য করেন তিনি। ব্যবস্থাও নেন সেইমত। দিনের বেলায় তাঁর ঘরে ডাক পড়লে আমাদের মুখ শুকিয়ে যায়।

কিন্তু এখন আমি অনেকটা অভিভাবকের ভঙ্গি নিয়ে দরজা খুলে ফেললাম। মাস্টারমশাই সামান্য চমকে মুখ তুলে তাকালেন। টেবিল-ল্যাম্প জ্বালিয়ে একটা মোটা বই পড়ছিলেন উনি। অল্পকাল তাকিয়ে থেকে লাজুক ভঙ্গিতে হেসে ফেললেন, 'কি খবর, দূত পাঠিয়েছে বুঝি?'

বললাম, 'হ্যাঁ। আপনাকে নিয়ে যেতে হবে!'

'আচ্ছা ছেলেমানুষ তোমরা! আমি কি বুড়োবয়সে লুকোচুরি খেলছি নাকি! এমনি একটা কাজ সারতে এলাম—'

'কোথায় কাজ! আপনি ত বই পড়ছেন!'

'বই পড়াটা বুঝি কাজ নয়? একজন শিক্ষক হয়ে বেশ বললে ত! তোমার ত এই অপরাধেই চাকরি যাওয়া উচিত!'

'সে কাল না হয় চার্জশীট দেবেন। এখন উঠুন।'

'হ্যাঁ। উঠতেই হবে দেখছি!' বাধ্য ছেলের মত জনার্দনবাবু বই বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালেন। চাদরটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিতে নিতে বললেন, 'না উঠে উপায় নেই ব্রাদার। পানের কৌটোটা যে ফেলে এসেছি! যদি মনে করে তোমাদের বৌদি ওটা দিয়ে দিত—'

এত অল্পেই কাজ হবে ভাবি নি। হয়ত পদমর্যাদার কথা ভেবেই জনার্দন-বাবু এত তড়িঘড়ি রাজি হয়ে গেলেন। কিংবা পানের কৌটোটাও একটা কারণ হতে পারে। দিনে অন্তত পঁচিশ ত্রিশ খিলি পান খান উনি। সঙ্গে জর্দা অথবা গুণ্ডি। ভাত না খেলে যদিবা একবেলা চলে পান বিহনে অসম্ভব। মাস্টার মশাইয়ের সব ক'টা দাঁত, মাড়ি ও ঠোঁট পানজর্দার রসে নিবিড় কালো। কথা বলার সময় ভুর ভুর করে তামাক পাতার গন্ধ আসে। কে বলতে পারে, দাম্পত্য কলহের শেষে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হবার সময় বিমলাবৌদিই কৌশল করে পানের কৌটোটা হাতসাফাই করেন নি?

জনার্দনবাবু বাতি নিবিয়ে বাইরে এলেন। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দরজায় তালা মারতে মারতে বললেন, 'ডাক্তারবাবুকে কারা ডাকছে না?'

বললাম, 'অনেকক্ষণ থেকেই ডাকছে।'

'চল ত দেখি।'

রাস্তার ও পাশেই হেলথ্ সেন্টার। পাকা গাঁথুনির উপর টিনের ছাউনি। তার পাশে ডাক্তার তরফদারেব কোয়ার্টার। জনার্দনবাবু এগিয়ে এসে বললেন, 'কে বটে হে? কে ডাকে ডাক্তারবাবুকে?' একটা লোক তরফদারের বারান্দা থেকে নেমে এসে বলল, 'আজ্ঞে, আমি বটে, লবীন!'

'কোন্ নবীন? ন'পাড়ার, না বাঁধাঘাটের?'

'আজ্ঞে আমি ন'পাড়ার ছুতোর লবীন।'

'কি হয়েছে তোমার?'

'আমার কিছু হয় নাই বাবু।' লোকটা আরো এগিয়ে এসে জনার্দনবাবুকে চিনতে পেরে পা ছুঁয়ে প্রণাম করল, 'আমার পিতিবেশি হারাণের বউ ফলিডল খেয়েছে আজ্ঞে—'

'ফলিডল খেয়েছে! কেন!'

'সি অনেক বিত্তান্ত মাস্টারবাবু। দশবছর বিয়া হয়েছে উয়াদের। ফি বছর ছেইলা প্যাটে আসে, কিন্তুক বাঁচে নাই। এই লিয়ে শাশুড়ী বৌয়ে ঝগড়া-

ঝাঁটি, চুলোচুলি। ইবার মরা ছেইলা জন্মাতেই বউটা পোকামারা বিষ খেয়ে লিলে—'

জনার্দনবাবু বললেন, 'কই সে? এখানে নিয়ে এসেছ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। রায়মশাইদের গরুর গাড়ীট করে লিয়ে এলম। হুই যে গাড়ী—'

জনার্দনবাবু দেখলেন। আমিও দেখলাম। হেলথ্ সেণ্টারের গা ঘেঁষে বহু পুরাতন নিমগাছটার তলায় একটা গরুর গাড়ী নামানো। ভাল করে না দেখলে অন্ধকারে বোঝার উপায় নেই। একপাশে একটা কালিপড়া লণ্ঠনের মিটমিটে আলো। আরো দু'একজন মানুষের সামান্য নড়াচড়া। কেউ একজন বুঝি ফুঁপিয়ে কাঁদছে—

জনার্দনবাবু তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে ডাকলেন, 'ডাক্তারবাবু! ও ডাক্তারবাবু!'

ডাঃ তরফদার বোধ হয় জেগেই ছিলেন। হেড্‌মাস্টারের পরিচিত গলা শোনামাত্র ভেতর থেকে সাড়া দিলেন। একটু পরেই ঘরের আলো জ্বলে উঠল। দরজা খুলে ডাঃ তরফদার বাইরে এলেন। জনার্দনবাবু বললেন, 'আপনাকে একটু ডিসটার্ব করলাম ডাক্তারবাবু। একটা জরুরী কেস এসেছে।'

ডাঃ তরফদার সামান্য লজ্জিত হয়ে বললেন, 'আপনাকে বুঝি ওরা ডেকে এনেছে? কি কাণ্ড দেখুন! আমি এক্ষুনি তৈরী হয়ে যাচ্ছি—'

সেদিন অনেকরাত পর্যন্ত আমি ও জনার্দনবাবু হেলথ সেণ্টারের ছোট অফিস ঘরটায় বসে রইলাম। ডাক্তারবাবু তৈরী হয়ে এলে হারাণের বউকে ধরাধরি করে গাড়ী থেকে নামানো হ'ল। কোয়ার্টার থেকে নার্সকে ডেকে পাঠানো হ'ল। ওয়ার্ড-বয় নিমু আলমারি খুলে নানারকম যন্ত্রপাতি বের করে ধুলো ঝেড়ে গরম জলে পরিষ্কার করতে শুরু করল। অল্পক্ষণের মধ্যেই মস্তবড় একটা রবারের নল জোর করে অচৈতন্য হারাণের বউয়ের গলা দিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হ'ল। তারপর পাম্প করে পাকস্থলী থেকে বিষ বের করার চেষ্টা চলতে লাগল।

কুড়োরাম জনার্দনবাবুর খোঁজ নিয়ে গেল ও দ্বিতীয় দফায় এসে পানের কৌটো দিয়ে গেল। একসঙ্গে তিনটে পান মুখে পুরলেন তিনি। তাঁর হাত একটু কাঁপছিল। কথা বলার সময় গলার স্বর অসম্ভব ভারি ঠেকছিল। হারাণের বউ সম্পর্কেই খোঁজখবর নিচ্ছিলেন তিনি। দারিদ্র্য, অজ্ঞতা অথবা ব্যাধি—ঠিক কোন্ কারণে হারাণের বউ আজ আত্মঘাতিনী, জানার

চেষ্টা করছিলেন। নবীনের উত্তর শুনে মাঝে মাঝে তাঁর মুখ শক্ত হয়ে উঠছিল, ওষ্ঠাধর আবেগে কাঁপছিল। একসময় আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমাদের দেশে কতরকম সমস্যা দেখ সুবিনয়। কারো ছেলে হয় না—তার জন্য মন্দিরে মসজিদে গিয়ে ধর্ণা দিয়ে পড়ে থাকে। কারো হয় ত অন্নাভাবে, অপুষ্টিতে বাঁচে না। আবার যদি বা কারো বাঁচল, মানুষ হ'ল না! শিক্ষার অভাবে, সুযোগের অভাবে জন্তু-জানোয়ারের সামিল হয়ে থাকল—'

বলতে বলতে একটু থামলেন জনাদনবাবু। হাতে আবার পান তুললেন। নবীনের দিকে তাকিয়ে একটু ধমকের সুরেই বললেন, 'তোমার ছেলেটাকে তাহলে স্কুল ছাড়িয়েই দিলে?'

নবীন দরজার ওপাশ থেকে হাত কচলে জবাব দিল, 'কি করি আজ্ঞে। প্যাটের জ্বালানিতে ছাড়ায়ে লিলম। এখন রায়মশাইয়ের ধান কল-টতে খাটছে। হপ্তা গেলে ন'টাকা মজুরি আজ্ঞে!'

ডাঃ তরফদার এসে বললেন, 'আপনি কেন বসে আছেন মাস্টারমশাই—'

জনার্দনবাবু বললেন, 'থাকি একটু।......কেমন বুঝছেন?'

তরফদার বললেন, 'ভাল না। দেখি কি হয়।'

কিন্তু কিছুই হ'ল না। রাত তিনটে নাগাদ হারাণের বউ মারা গেল। ফলিডল যে এমন মারাত্মক বিষ আমার জানা ছিল না। তা ছাড়া গ্রামের ছোট হাসপাতালে ওষুধপত্র যন্ত্রপাতি সব নেই। যা আছে তা দিয়ে জরজারি কোনরকমে ঠেকানো যায়, বিষাক্ত মানুষকে সজীব করা চলে না।

ভোররাতের দিকে আমি ও জনার্দনবাবু নিঃশব্দে যে যার কোয়ার্টারে ফিরে গেলাম। যাবার সময় হোস্টেলের কয়েকটা ছেলেকে ডেকে দিয়ে গেলেন জনার্দনবাবু। দরকার হলে ওরা নবীন ও হারাণকে মৃতদেহ সংকারের কাজে সাহায্য করবে। ডেডবডি পোস্টমর্টেমের জন্য সদরে পাঠানো হবে না। ডাঃ তরফদার অনুগ্রহ করে 'স্বাভাবিক মৃত্যু'র সার্টিফিকেট দিয়েছেন। মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা আর কে দিতে চায়! আর তার ঝামেলাই বা কি কম! ডাঃ তরফদারের এত ঝামেলা পোষায় না।

সেদিন বিমলাবৌদির সঙ্গে কি নিয়ে জনার্দনবাবুর কলহ হয়েছিল—কয়েকদিন পরেই আমরা তার কিছুটা জানতে পেরেছিলাম। কোনো কথা গোপন রাখার অভ্যাস জনার্দনবাবুর নেই, তা সে যতই ব্যক্তিগত পারিবারিক সংবাদ হোক না কেন। গল্পের আসরে একদিন না একদিন সব তিনি ফাঁস

করবেনই। এই নিয়ে বিমলাবৌদির সঙ্গে পুনরায় মান অভিমানের পালা শুরু হবে এবং অচিরে তার সমাপ্তিও ঘটবে। এটাই হ'ল সাধারণ নিয়ম।

কথা হচ্ছিল চন্দ্র-অভিযান সম্পর্কে। সম্প্রতি রাশিয়া নতুন পর্যায়ে আর একটি স্পুটনিক মহাকাশে পাঠিয়েছে। এবার আরোহী আর বানর নয়, মানুষ। ফিজিক্সের অসীম এ বিষয়ে আমাদের একটু জ্ঞান দিচ্ছিল। এক সময় মাস্টারমশাই বলে উঠলেন, 'মানুষ চাঁদে গেলে কি হবে মশাই, আপনাদের বৌদি সেই মহাভারতের যুগে—'

'কি রকম?' আমাদেব মধ্যে কেউ বিমলাবৌদির দিকে চোখ রেখে প্রশ্ন করল। জনার্দনবাবু হাতের তেলো দিয়ে থুতনি ঘষতে ঘষতে বললেন, 'আপনাদের বৌদিকেই জিজ্ঞেস করুন না! কি গো, বলব নাকি তোমার সেই মাদুলির কথা—'

দেখলাম, অন্যদিনের মত ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন না বিমলাবৌদি। তাঁর ফর্সা মুখখানা মুহূর্তে থমথমে হয়ে উঠল। উঠে দাঁড়ালেন তিনি। তারপর নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেলেন। জনার্দনবাবু কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'দেখলেন, লজ্জায় কেমন পালিয়ে গেল! আরে মশাই, মেডিক্যাল সায়েন্স যা পারেনি, তা কি কবচ-তাবিজে পারে! ওই নিয়েই ত গণ্ডগোল সেদিন! তারপর আমি গৃহহারা, লক্ষ্মীছাড়া! ভাগ্যিস্ সুবিনয় ধরে আনতে গিয়েছিল!'

বলে স্বভাবসুলভ সারল্যে হেসে উঠলেন জনার্দনবাবু। কিন্তু আমরা কেউই সে হাসিতে যোগ দিতে পারলাম না। মাদুলির রহস্য আমরা ততক্ষণে বুঝতে পেরেছি। সে রাত্রে জনার্দনবাবু হারাণের বউয়ের জন্য সারারাত কেন হাসপাতালে জেগে বসেছিলেন—তাও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাঁর সেদিনের কথাগুলোও মনে পড়ছে। বিমলাবৌদির হঠাৎ উঠে যাওয়ার মধ্যে শুধু লজ্জা নয়, একটি নিঃসন্তান নারীর গভীর বেদনাও যে লুকিয়ে আছে, আমরা সবাই তা অনুভব করছিলাম। এই মুহূর্তে জনার্দনবাবুর সারল্যকে আমাদের অসম্ভব নিষ্ঠুরতা বলে বোধ হ'ল। এ ব্যাপারে বিমলাবৌদির প্রতি তাঁর প্রশ্রয় আরো উদার, আরো কোমল কেন হবে না, আমি কিছুতেই ভেবে পেলাম না। জনার্দনবাবুর হাসি থামতে না থামতে আমি উঠে নীচে চলে এলাম। ঠিক যা ভেবেছিলাম তাই, বিমলাবৌদি বালিশে মুখ রেখে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন!

হারাণের বউ মারা যাওয়ার মাস পাঁচেক পরে এই গ্রামে ছোটোখাটো দু'একটা ঘটনা ঘটল। আর তাকে কেন্দ্র করেই জনার্দনবাবুর চাকরি যাবার উপক্রম হ'ল।

প্রথমে সূত্রপাত হ'ল দুটো সাইনবোর্ড নিয়ে। দুটোই পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত। স্কুল আর হেলথ সেণ্টারের মাঝামাঝি পাকা রাস্তার উপর খুঁটি পুঁতে সাইনবোর্ড দুটো ঝোলানো হ'ল। একটায় ঘন লাল রঙে একটা ত্রিভুজ আঁকা, নীচে হাল্কা সবুজ অক্ষরে লেখা: 'পরিবার পরিকল্পনার চিহ্ন এই লাল ত্রিকোণ।' আর একটায় গাঢ় লাল রঙে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা: 'দুটি অথবা তিনটি সন্তানই যথেষ্ট। আপনার সন্তান সংখ্যা সীমিত রাখার জন্য 'নিরোধ' অথবা 'লুপ' ব্যবহার করুন।'

এ দুটো স্থায়ী সাইনবোর্ড ছাড়াও হরেক রকমের কাগুজে পোস্টারও এল। হেলথ সেণ্টারের লম্বা বারান্দায় সেগুলো এমনভাবে সাঁটানো হ'ল যাতে করে স্কুলের উঠোনে দাঁড়িয়েও সরকারীসাহায্যে হ্রাসপ্রাপ্ত মূল্যে লভ্য নিরোধের সচিত্র বিবরণী অনায়াসে পাঠ করা যায়।

প্রথম যেদিন লাল-ত্রিকোণ-মার্কা সাইনবোর্ডটা এল, আমরা বললাম, 'এইরে, এসে গেছে! রেড সিগন্যাল!' ইতিহাসের শম্ভুদা বলল, 'শুধু রেড? একেবারে ডেঞ্জার সিগন্যাল!' কেমেস্ট্রির মধু বলল, 'কিন্তু লাল রং দেখলে শুনেছি বলদ-মোষ আরো ক্ষেপে যায়?'

আমরা সবাই হেসে উঠলাম।

কিন্তু এরপর নিরোধ ও লুপ সম্পর্কিত দ্বিতীয় সাইনবোর্ডটা যখন এল এবং প্রকাশ্যে স্কুলের দিকে মুখ করে সেটাকে সাড়ম্বরে টাঙানো হ'ল তখন আমরা আর হাসতে পারলাম না। অকারণেই বড় বেশী গম্ভীর হয়ে গেলাম। স্কুলের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে ওই রাস্তাটুকু পার হতে আমাদের রীতিমত লজ্জা করতে লাগল। সংস্কৃতের বিধুভূষণ টিচার্সরুমে একদিন বলেই ফেললেন, 'কি কাণ্ড, ছি, ছি!'

মধু রসিকতা করে বলল, 'সত্যি পণ্ডিতমশাই, ওসব অন্ধকারের জিনিষ, আলোতে আনা কেন।'

বিধুভূষণ খুক খুক করে হেসে বললেন, 'ঠিক বলেছ মধু! অন্ধকারের জিনিষ—'

ইংরেজীর নিত্যচরণবাবু বিধুভূষণের সমবয়স্ক। কাগজ থেকে মুখ তুলে বললেন, 'হাসির কথা নয় পণ্ডিত। এর আফটার এফেকটটা ভেবে দেখেছ?

ক্লাসে ছেলেরা যদি শুধোয় 'নিরোধ' কি, 'লুপ' কি, তাহলে অবস্থাটা কি দাঁড়াবে ?'

বিধুভূষণ বললেন, 'হুঁম্, ভাবনার কথাই বটে। সংস্কৃত সাহিত্যে ভূরি ভূরি 'শৃঙ্গার' আছে কিন্তু বাৎসায়নের কামশাস্ত্রেও লুপ ব্যবহারের কথা ত কিছু নেই !'

এগ্রিকালচারের তেজেনবাবু বলল, 'কেউ জিজ্ঞেস করবে না নিত্যদা। ও আজকাল সবাই জানে !'

'জানে ? কি করে জানল !'

'রেডিওতে কাগজে আকছার ওর বিজ্ঞাপন চলছে।'

'চলুক। আমাদের গাঁয়ের ক'টা ছেলে কাগজ দেখে, রেডিও শোনে ?'

'আরে, দেশলাই ত দেখে। ওর পিছনেও সেই বিজ্ঞাপন।'

'বেশ, তা না হয় দেখল, জানল।' কেমিস্ট্রির মধু মুখ খুলল আবার, 'কিন্তু আমার একটা সমস্যার সমাধান করুন দেখি—'

তেজেনবাবু বলল, 'কি সমস্যা ?'

'পরিবার পরিকল্পনার সব বোর্ডেই দেখি দুটো ছেলে, একটা মেয়ের ছবি। কিন্তু গুনে গুনে দুটো ছেলে, একটা মেয়েই যে হবে তার গ্যারিন্টি কি !'

'খাঁটি কথা !' বিধুভূষণ উত্তেজনায় প্রায় চিৎকার করে উঠলেন, 'আগে তার ওষুদ বার করুক দেখি শালারা ! আমার পর পর পাচটা মেয়ের পর একটা ছেলে—'

নিত্যবাবু মুচকি হেসে নীচু গলায় বললেন, 'হেলথ সেণ্টারে প্রথম নামটা তুমিই লেখাও পণ্ডিত !'

সবমিলিয়ে আমরা ব্যাপারটাকে একটু লঘু করে দেখলেও একজন কিন্তু দেখলেন না। তিনি জনার্দনবাবু। প্রথম ত্রিকোণেই তাঁর মুখ গম্ভীর হয়ে উঠেছিল। দ্বিতীয় সাইনবোর্ডের ভাষা দেখে তিনি রীতিমত ক্রুদ্ধ হলেন। তারপর বিশ্রাম-সময়ে ছেলেমেয়েরা হেলথ সেণ্টারের বারান্দায় কাগুজে-পোস্টার-গুলোর দিকে উঁকি ঝুঁকি মারছে দেখে দুশ্চিন্তায় তাঁর কালো মুখ আরো কালো হ'ল। সন্ধ্যাবেলায় ছাদের আসরে খুব গুরুত্ব দিয়েই তিনি বললেন, 'এটা চলতে দেওয়া যায় না। কো-এডুকেশনাল স্কুল আমাদের। বড়ো বড়ো মেয়েরা পড়ে। ওইসব দেখবে, শুনবে। হাসি ঠাট্টা করবে।' বিমলাবৌদি উঠে যাচ্ছিলেন। জনার্দনবাবু লক্ষ্য করলেন। মুখে পান পুরে একটু হেসে বললেন, 'চলে যাচ্ছ ? যাও ! এসব আলোচনা ফর এডাল্টস্ ওনলি।'

বিমলাবৌদি মুখ ঘুরিয়ে বলে গেলেন, 'সে জন্যই ত ওরা বেছে বেছে তোমার স্কুলের নাকের ডগায় সব ঝুলিয়ে গেছে!'

জনার্দনবাবু বললেন, 'উঁহু, এর একটা বিহিত করতে হয় সুবিনয়। আমি কালই ডাঃ তরফদারকে বলব। তোমরা সব সঙ্গে থাকবে।'

ডাঃ সন্তোষ তরফদার সব শুনে বললেন, 'যেতে দিন মাস্টারমশাই। ও এখন ডালভাত। ও নিয়ে কেউ আজকাল মাথা ঘামায় না।'

জনার্দনবাবু বললেন, 'না ডাক্তারবাবু। কথাটা শহরের পক্ষে প্রযোজ্য হলেও গণ্ডগ্রামের পক্ষে ঠিক না। ছেলেমেয়েরা এরি মধ্যে বলাবলি শুরু করেছে। আমি নিজের কানে শুনেছি।'

তেজেনবাবু বলল, 'সেদিন টেন-বি-র ক্লাসে ব্লাকবোর্ডে কে যেন লাল চক দিয়ে ত্রিভুজ এঁকে রেখেছিল—'

ডাঃ তরফদার বললেন, 'ও দু'চারদিন। তারপরই পুরনো হয়ে যাবে।'

জনার্দনবাবু এবার একটু ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, 'আপনি তাহলে কোনো ব্যবস্থা করবেন না?'

তরফদার একটু সময় নিয়ে ভেবে বললেন, 'দেখুন মাস্টারমশাই, ওটা সরানো আমার উপর নির্ভর করে না। ওসব ফ্যামিলি প্লানিং ডিপার্টমেন্টের এক্তিয়ারে। আমার কোন ক্ষমতা নেই!'

জনার্দনবাবু বললেন, 'আপনি তাহলে সদরে লিখুন—'

তরফদার বললেন, 'লিখব। আপনিও ডিষ্ট্রিক্ট প্ল্যানিং অফিসারকে একটা চিঠি দিন মাস্টারমশাই!'

কিন্তু লেখা লেখিতে কোনো কাজ হ'ল না। বরং আরো একরাশ কাগুজে পোস্টার এসে হেলথ সেণ্টারের বারান্দার প্রাচীরগাত্রে লম্বমান হ'ল। তার কোনটায় পুরুষের প্রতি নির্বীজকরণের আহ্বান, কোনোটায় নারীর বন্ধ্যাকরণের। নানারূপ আর্থিক সুযোগ সুবিধার কথাও ঘোষিত হ'ল। পোস্টারের লাল নীল ও হলুদবর্ণের বিচিত্র সমারোহে আকৃষ্ট হয়ে ছেলেমেয়েরা স্বভাবতই চারপাশে ঘুর ঘুর করতে লাগল। তাদের চোখেমুখে গ্রাম্য অজ্ঞতার সঙ্গে এক ধরনের কৃত্রিম শহুরে সলজ্জ চাপা উত্তেজনা। তারপর এক সপ্তাহ পার না হতেই ক্লাস ইলেভেনের মেয়েদের বেঞ্চিতে ছুরির ডগার অস্পষ্ট অপটু লিখন দেখা গেল, 'সখিগো, লুপ লাইনে আসিও।'

যথারীতি হেডমাস্টারের কাছে রিপোর্ট এল। জনার্দনবাবু চোখমুখ ভয়ঙ্কর করে সবচেয়ে শক্ত বেতখানায় হাত রাখলেন। অপরাধীও ধরা পড়ল।

ডাঃ তরফদারের ছেলে, সঞ্জয়। জনার্দনবাবু ক্লাসরুম থেকে ফিরে এসে এই প্রথম পিওন পাঠিয়ে তরফদারকে নিজের ঘরে ডেকে আনলেন।

তরফদার লজ্জায় আধোমুখ হয়ে বললেন, 'ছেলেকে আপনি আরো মারুন মাস্টারমশাই। মেরে ওর পিঠের ছালচামড়া তুলে দিন—'

জনার্দনবাবু বললেন, 'উহুঁ, শুধু ছেলেদের মেরে কিছু হবে না। আমি ত আপনাকে আগেই বলেছি, স্কুলের সামনে থেকে ওসব সরানো দরকার।'

তরফদার বললেন, 'ও ব্যাপারে আমার যে কোন হাত নেই মাস্টারমশাই।'

'তাহলে যা করার আমিই করব। কালই লোক লাগিয়ে উপড়ে ফেলব সব—'

ডাঃ তরফদার বিব্রত হয়ে বললেন, 'না মাস্টারমশাই, ও কাজও করবেন না। আইনের প্যাঁচে পড়ে যাবেন তাহলে। আমি বরং আজই একবার সদরে যাচ্ছি—'

ডাঃ তরফদার চলে গেলে শম্ভুবাবু তেজেনবাবুদেরও ডেকে পাঠালেন। হেড্মাস্টারের ঘরে আমরা গোল হয়ে বসলাম সবাই। স্কুলে যে গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে তার চুলচেরা বিচার শুরু হ'ল। একসময় জনার্দনবাবু বললেন, 'ডাঃ তরফদারকে দিয়ে কোনো কাজ হবে না, তেজেনবাবু। যা ব্যবস্থা করার আমাদেরই করতে হবে!'

তেজেনবাবু বলল, 'চলুন সবাই মিলে আমরা একদিন সদরে যাই।'

জনার্দনবাবু বললেন, 'তা যাওয়া যেতে পারে। তারপরে ওতেও যদি কাজ না হয় আমি গ্রামের মানুষদের ডেকে বলব। ওদের ঘরে ঘরে গিয়ে বোঝাব। ...হ্যাঁ, সুবিনয়, গাঁয়ের লোকেরা আমার কথা শুনবে। আমাকে ওরা ভালবাসে। স্কুলের সামনে থেকে ও পাপ আমি দূর করবই—'

আমি বললাম, 'আপনি যা-ই করুন মাস্টারমশাই, আমরা আপনার সঙ্গে আছি।'

আসলে জনার্দনবাবুর যেন জিদ চেপে গিয়েছিল। আমাদের নিয়ে সদরে যাওয়ার জন্য তৈরী হতে লাগলেন তিনি। সংবাদপত্রের জন্য ইংরেজি ও বাংলায় চিঠি প্রস্তুত করলেন। শিক্ষাবিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সমস্ত ঘটনা জানিয়ে পুরো সাত পাতার একটি আবেদনপত্র শিক্ষামন্ত্রীর নামে পাঠানো হ'ল। ওই সমস্ত অস্বাস্থ্যকর বিজ্ঞাপনগুলো স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে উৎখাত করতে আইনগত কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় কিনা—এ বিষয়ে জনার্দনবাবু তাঁর এক উকিলবন্ধুর কাছে পরামর্শও চেয়ে পাঠালেন। ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি সমস্যা

ও সাধারণ জনসংখ্যাতত্ত্ব সম্পর্কে নতুন করে গভীর মনোযোগে পড়াশুনাও শুরু করলেন। ওঁর বাড়ীর সান্ধ্যআসর লঘু গল্পগুজবের পরিবর্তে অর্থনীতির নানা জটিলতত্ত্বের ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ ও আলোচনায় বিষম গুরুগম্ভীর হয়ে উঠল। আমরা প্রায় গুণমুগ্ধ ছাত্রের আনুগত্য নিয়ে এই শিক্ষকের কাছে শুনলাম, ম্যালথসের জনসংখ্যা-তত্ত্ব আসলে ধনিকশ্রেণীর শোষণ চিরস্থায়ী রাখার একটি সুন্দর হাতিয়ার। জমির উৎপাদন সম্পর্কিত ক্রমহ্রাসমানতার নিয়ম বিজ্ঞানের দ্বারা খণ্ডিত হতে পারে। স্ত্রী জাতিকে সন্তান-প্রজননের যন্ত্ররূপে ব্যবহার না করে পরিপূর্ণ নারীমুক্তি শুধু সমাজতন্ত্রেই সম্ভব। সাম্রাজ্যবাদী ধনতান্ত্রিক দেশে জনসংখ্যাবৃদ্ধি শোষণের মূলেই আঘাত করে কেননা জনসাধারণই বিপ্লব করে।

শুনতে শুনতে আমি অবাক হয়ে জনার্দনবাবুর মুখ দেখছিলাম। একটু বক্তৃতার ঢঙে যথেষ্ট আবেগ মিশিয়ে কথাগুলো বলে যাচ্ছিলেন উনি। মাঝে মাঝে থামছিলেন, পান মুখে তুলে নিচ্ছিলেন, তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে বলে উঠছিলেন, 'কি মশাই, সত্যি বলিনি? বলুন না তেজেনবাবু, আপনি ত এগ্রিকালচারের লোক, সায়েন্স ইচ্ছে করলে এক জমিতে চারবার কি ফসল ফলাতে পারে না? তাহলে? লোকের জন্যই এদেশে বেকার সমস্যা, খাদ্য সমস্যা, এসব কথা স্বীকার করি কি করে!'

তেজেনবাবু উত্তর দিচ্ছিলেন না। আমরা কেউই কথা বলছিলাম না। জনার্দনবাবুকে বিনা বাধায় বলতে দিয়ে আমরা সবাই গভীর আগ্রহে তাঁর কথা শুনছিলাম। পরিবার পরিকল্পনার যে-বিজ্ঞাপনগুলো আমাদের কাছে শুধুই হাসিঠাট্টার বিষয় ছিল, তার পিছনে এমন যে গূঢ় তত্ত্ব আর কুটিল চক্রান্ত লুকিয়ে আছে তা কে জানত!

সপ্তাহ দুই পরে জনার্দনবাবুর নেতৃত্বে আমরা যখন সদরে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছি তখন একদিন দুপুরের দিকে ত্রিকোণ-অঙ্কিত সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগের একটি জীপগাড়ী স্কুলের চত্বরে এসে থামল। শনিবার বলে স্কুল ছুটি হয়ে গিয়েছিল। জনার্দনবাবু তাঁর ঘরে বসে দরকারি কাজ করছিলেন। আমি আর শম্ভু টীচার্সরুমে স্কুল-ম্যাগাজিনের লেখা বাছাই করছিলাম। জীপগাড়ীর শব্দে আমরা বাইরে এলাম।

বেশ লম্বা-চওড়া এক ভদ্রলোক গাড়ী থেকে নামলেন। পরণে ছাই রঙের দামী স্যুট, এক হাতে ফাইল, অন্যহাতে জ্বলন্ত সিগেরেট। আমাকে সামনে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'হেড্‌মাস্টারের ঘর কোন্‌টা? আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

বলার ভঙ্গিটা আমার ভাল লাগল না। একটু যেন মাতব্বরী ঢঙ্। স্কুলের চারদিকে তাকানোর ভঙ্গিতেও কেমন একটা উপেক্ষার ভাব। আমি মনে মনে বিরক্ত হয়ে তাঁকে জনার্দনবাবুর কাছে নিয়ে গেলাম।

ভদ্রলোক বসতে বসতে বললেন, 'আমি ডিস্ট্রিক্ট ফ্যামিলি প্ল্যানিং অফিসার। শুনলাম আপনি এখানে আমাদের প্রচারকার্যে বাধা দিচ্ছেন?'

জনার্দনবাবু বললেন, 'বাধা দিচ্ছি! কে বলল?'

'আমার কাছে লিখিত রিপোর্ট আছে। আপনি নাকি সাইনবোর্ডগুলো তুলে ফেলবেন বলে শাসিয়েছেন!'

প্ল্যানিং অফিসারের গলার স্বর একইরকম রূঢ় শোনাচ্ছিল। যেন প্রধান শিক্ষক নন, একজন অধস্তন কেরাণীর সঙ্গে কথা বলছেন তিনি! জনার্দনবাবু তা লক্ষ্য করলেন। তাঁর মুখের মৃদু আপ্যায়নের হাসিটুকু মুছে গেল। চোয়ালের হাড় শক্ত হয়ে উঠল। কৌটো খুলে পান মুখে দিলেন। হাতে জর্দা ঢালতে ঢালতে বললেন, 'আপনি কি বলতে এসেছেন, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না ত!'

প্ল্যানিং অফিসার বললেন, 'হেলথ সেণ্টারে ওই বিজ্ঞাপনগুলো থাকলে আপনার অসুবিধা কি?'

'কিছুমাত্র না! যত অসুবিধা স্কুলের ওই নাবালকদের নিয়ে—'

'বেশ ত! ওরাও শিখুক, জানুক। এটাও শিক্ষার একটা অঙ্গ!'

জনার্দনবাবু ঘাড় নাড়লেন, 'না মশাই, এটা এখুনি ওদের জানার বিষয় না! আর গ্রামে যাদের জানার প্রয়োজন তাদের প্রায় সবাই ত নিরক্ষর—বানান করে পড়ে না দিলে কিছুই ওরা বুঝতে পারে না!'

'তাদের জন্য গ্রামসেবিকারা আছে।'

'তাহলে আর এ সব বিজ্ঞাপনের সার্থকতা কি?'

প্ল্যানিং অফিসার ছাইদানিতে সিগেরেট গুঁজতে গুঁজতে বলে উঠলেন, 'আমার সন্দেহ হচ্ছে, আপনি সেইসব সেকেলে মানুষদের দলে যারা এখনো ফ্যামিলি প্ল্যানিং সমর্থন করেন না!'

জনার্দনবাবু একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'ঘোড়ার আগে গাড়ী জুড়লে কেই-বা সমর্থন করে?'

'ঘোড়ার আগে গাড়ী! কি বলছেন আপনি! জানেন, ভারতের জন সংখ্যা কি হারে বেড়ে যাচ্ছে? জানেন, আর মাত্র ৩০ বছর পরে আমাদের জনসংখ্যা দাঁড়াবে ১০০ কোটি? পা রাখার পর্যন্ত জায়গা থাকবে না এদেশে?'

'তখন সমুদ্রের নীচে চাষ হবে। ভূগর্ভে বাড়ী হবে। বিজ্ঞান ত জনসংখ্যার চেয়েও দ্রুত হারে এগিয়ে থাকে!'

'অবাস্তব কল্পনা!'

'তার চেয়েও অবাস্তব কল্পনা শিক্ষা-সমস্যা, খাদ্য-সমস্যা, বেকার-সমস্যা, দূর না করে পরিবার পরিকল্পনার সার্থকতা খোঁজা। জনসংখ্যার জন্য দারিদ্র্য নয় দারিদ্র্যই জনসংখ্যা বৃদ্ধির একমাত্র কারণ।'

'আমি মনে করি ঠিক উল্টো। জনসংখ্যা হু হু করে বাড়ছে বলেই কোনো সমস্যা মিটছে না। সরকার হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে।'

'মূল সমস্যাটা ধরতে না পারলে সেটাই স্বাভাবিক। পৃথিবীতে পঁচাত্তর কোটি মানুষের দেশও আছে, অথচ পরিবার পরিকল্পনা নিয়ে সেখানে এমন চিৎকার নেই!'

'সর্বনাশ! আপনি চীনের কথা বলছেন! সেখানে কি চিৎকার করার উপায় আছে!'

জনার্দনবাবু বললেন, 'চীন-রাশিয়ার কথা না, আমি বলছি তত্ত্বের কথা। অর্থনীতির কথা। ...ডাক্তারবাবু, আপনি মার্কস পড়েছেন?'

'মার্কস!'

'আজ্ঞে হাঁ। জার্মানীতে জন্মেছিলেন, সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা! তিনি অনেককিছুর মত জনসংখ্যাসমস্যার পুরনো থিওরীকেও বাতিল করে দিয়ে গেছেন। তাঁর মতে, জনগণ হচ্ছে দেশের সম্পদ। কেননা মানুষ বাড়লেই শ্রমশক্তি বাড়ে, উৎপাদন বাড়ে—'

'মহামারী, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধও বাড়ে—'

'না ডাক্তারবাবু, ওটাও বাতিল থিওরি। ধনতান্ত্রিক দেশে জনসংখ্যা বাড়লে বিপ্লব আসন্ন হয়। আপনাদের আসল ভয়টা ত সেইখানেই!'

ডাক্তারবাবু খুব উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন, 'আপনার যুক্তিগুলো সব উদ্ভট!'

'কিন্তু আপনাদের পক্ষে খণ্ডন করার সাধ্য নেই।' জনার্দনবাবুও সংযত দৃঢ় গলায় জবাব দিলেন, 'শুধু এদেশে কেন, সব পুঁজিবাদী রাষ্ট্রই জনগণকে ভয় করে!...আপনি একটু ভেবে দেখবেন ডাক্তারবাবু, পরিবার পরিকল্পনার চেয়ে এই মুহূর্তে আমাদের পাঁচশালা পরিকল্পনাগুলি বেশী জরুরী কিনা—'

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর ডিস্ট্রিক্ট ইন্‌চার্জ। তাঁর ফর্সা মুখ উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠেছে। চোখের দৃষ্টিতে ক্রুদ্ধভাব। ফাইলটা

টেবিল থেকে তুলে নিতে নিতে বললেন, 'আই সী! আপনি দেখছি একজন কট্টর কম্যুনিস্ট! এখানে গা-ঢাকা দিয়ে আছেন!'

জনার্দনবাবুও উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'ওই সাইনবোর্ডগুলো আপনি তাহলে তাড়াতাড়ি সরিয়ে দেবেন।'

এ কথার কোন জবাব না দিয়ে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। একটু পরেই গাড়ী স্টার্ট নেওয়ার শব্দ উঠল।

তারপর চব্বিশ ঘণ্টা পার হতে না হতে মৌচাকে যেন ঢিল পড়ল!

ডিস্ট্রিক্ট স্কুল বোর্ডের ডি-আই-সাহেব জরুরী চিঠি পাঠালেন সেক্রেটারী নিত্যানন্দ মাইতিকে। নিত্যানন্দ হন্তদন্ত হয়ে সদরে ছুটলেন। পরেরদিনই স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি তারাগতি পাঠকের ধানকলের অফিস-ঘরে রুদ্ধদ্বার গোপন আলোচনা সভা বসল। জরুরী চিঠি গেল নিত্যানন্দের ছোটমামার দপ্তরে! তিনি ম্যানেজিং কমিটির শিক্ষানুরাগী-সভ্য। জীবনে কখনো কোনো মিটিঙে উপস্থিত থাকেন নি। সেই তিনিও কলকাতার হাজার কাজ ফেলে গ্রামে ছুটে এলেন! বারোঘণ্টার নোটিশে স্কুল-পরিচালক-সমিতির বিশেষ জরুরী সভা ডাকা হ'ল। আলোচনার বিষয় একটাই— 'পরিবার পরিকল্পনা দপ্তরের প্রচারপত্র ও প্রধানশিক্ষকের কার্য্যাবলী।'

প্রধানশিক্ষকের ঘরেই সভা বসল। শিক্ষক-প্রতিনিধি হিসেবে আমি উপস্থিত থাকলাম। চিকিৎসক-প্রতিনিধিরূপে ডাঃ তরফদারও এলেন। সভার কাজ শুরু হলে সভাপতি বললেন, 'আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ খুব গুরুতর মাস্টারমশাই—'

জনার্দনবাবু বললেন, 'বলুন, শুনি।'

ডাঃ তরফদার বললেন, 'সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের হেড্‌মাস্টার হয়ে আপনি সরকারী পরিকল্পনার বিরোধিতা করছেন।'

নিত্যানন্দ বললেন, 'আপনি গাঁয়ের চাষাভূষোদের ক্ষেপিয়ে সই সংগ্রহ করছেন।'

নিত্যানন্দের ছোটমামা বললেন, 'আপনি স্কুলে চীনের নাম করেছেন, মার্কসের তত্ত্ব পড়াচ্ছেন।'

সভাপতি সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি নাকি মশাই, একজন কমিনিস্ট?'

আমি কিছু বলতে যাচ্ছিলাম। জনার্দনবাবু হাত নেড়ে আমায় থামিয়ে দিলেন। তাঁর প্রৌঢ় দেহে বিকেলের সূর্যাস্তরেখা কাঁচের জানালা দিয়ে

এসে পড়েছিল। কালো মুখের পেশীগুলো খুব শক্ত সংবদ্ধ মনে হচ্ছিল। চেয়ারে পিঠ রেখে খুব ঋজুভঙ্গিতে বসেছিলেন তিনি। হাতের মুঠোয় পানের রুপোলি কৌটোটি সযত্নে ধরা ছিল।

আস্তে আস্তে জনার্দনবাবু বললেন, 'সভাপতিমশাই, অভিযোগগুলো সত্যি খুব গুরুতর। কিন্তু একজন শিক্ষক হয়ে আমি মিথ্যে কথা কি করে বলি? কি করে বলি, আমার দেশের মানুষ আমার দেশের শত্রু? মায়ের কোলে প্রতিদিন যে শিশু জন্মাচ্ছে—সে তার বোঝা, তার ভার? আমার দেশের এত জমিজমা, এত বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে সে কথা বলার অবস্থা ত এখনও আসে নি।···কিন্তু এতসব বড়ো বড়ো কথায় আমি যেতে চাই নি। আমি শুধু আমার স্কুলের ছেলেমেয়েদের কথা ভেবে ওই সাইনবোর্ডগুলো সরাতে বলেছি। ওই ছেলেমেয়েরা ত এই গ্রামেরই ছেলেমেয়ে, আপনাদেরই ছেলেমেয়ে। আমার কাছে হয়ত ওরা আরো একটু বেশী, সে আমি নিজে অপুত্রক, নিঃসন্তান বলেই—'

বলতে গিয়ে হঠাৎ চুপ করলেন জনার্দনবাবু। শেষের দিকে তাঁর কণ্ঠ একটু যেন ভারি শোনাল। আমি চমকে উঠে তাঁর মুখের দিকে তাকালাম। সঙ্গে সঙ্গে বিমলাবৌদির সেদিনের সেই কান্নার কথা আমার মনে পড়ে গেল। দেখলাম, জনার্দনবাবুর কালো শক্ত পেশীবহুল মুখে প্রতিরোধের দৃঢ় দীপ্তির সঙ্গে একটি কোমল বেদনার ছায়া সূর্যাস্তের পাণ্ডুর রঙের সঙ্গে মিলেমিশে স্থির হয়ে আছে।

আবার কথা শুরু করার জন্য যেন একটু দম নিচ্ছেন তিনি······

৩ কপাটে করাঘাত

এক ধরণের খুটখুট শব্দে ঘুম ভেঙে গেল ভূধরবাবুর। চোখ না খুলে এবং নিঃশ্বাস বন্ধ রেখে শব্দটার স্বরূপ বুঝতে চাইলেন। প্রথমে মনে হ'ল উপরের পাখা থেকে উঠছে। অনেকদিনের পুরনো পাখা, মাঝে মাঝে কট্‌ কট্‌ শব্দ করে। চোখ খুলে অন্ধকারে উপরের দিকে তাকালেন। তখন মনে হ'ল, খাটের তলা থেকে উঠছে। তাহলে কি ইঁদুর? খাটের তলায় রাজ্যের জিনিস-পত্র স্তূপাকার করা আছে। পুরনো বাসন, বাক্স-প্যাটরা, চালের টিন, গমের টিন। দল বেঁধে ইঁদুরেরা ঘুরে বেড়ায়। ওদের শরীরে লেগে টিনে বা তোরঙ্গে নানারকম শব্দ হয়, ভূধরবাবুর ঘুম ভেঙে যায়। বয়সের জন্য এবং অম্ল ও অজীর্ণে ভুগে ভুগে তাঁর ঘুম এখন বড় পাতলা। সাধ্যসাধনা করে ডেকে আনতে হয়। ভেঙে গেলে আর ফিরে আসতে চায় না।

কিন্তু শব্দটা ইঁদুরেরও না। এতক্ষণে পুরোপুরি ঘুম ভেঙে যাওয়ায় মনে হ'ল কেউ দরজার কড়া নাড়ছে। কোথায়? এই তিনতলার কোনো ঘরে কি? অথবা দোতলায়? সহসা ভূধরবাবুর শ্রবণশক্তি যেন অতিমাত্রায় প্রখর হয়ে উঠল। সমস্ত ইন্দ্রিয় তীব্র সচেতনতা পেল। মনে হ'ল নীচের তলায় সদর দরজার কড়া ধরে কেউ ঝাঁকুনি দিচ্ছে। শক্ত সবল হাতের খট্‌ খট্‌ কড়া-নাড়ার ধাতব শব্দ এই মান্ধাতার আমলের বাড়ীটার ঘর-বারান্দা-দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে বন্ধ-কপাটের এ-পাশে ভূধরবাবুর শয়নকক্ষে অপেক্ষাকৃত ক্ষীণভাবে প্রবেশ করছে।

কে কড়া নাড়ছে? এখন রাত কত?

ভূধরবাবুর বয়স্ক কপালে দুশ্চিন্তার রেখা ফুটল। ভ্রূ কুঁচকে গেল। বালিশ থেকে মাথাটা আরো একটু উপরের দিকে তুলে ধরলেন। কেমন একটা ভয়-ভয় দৃষ্টিতে ঘরের নীরন্ধ্র অন্ধকার, অন্ধকারে পাখার গোল মাথা থেকে বিচ্ছুরিত হাল্কা নীল আলোর স্পার্ক লক্ষ্য করলেন। ডানদিকের হ্রস্ব জানালা দিয়ে বাইরের আকাশ দেখে সময় অনুমানের চেষ্টা করলেন। খেয়ে

দেয়ে যখন শুয়েছিলেন তখন রাত এগারোটা। তারপর ঘণ্টা দুই অন্তত ঘুম আসেনি তাঁর। এখন রাত আড়াইটে তিনটে। এই নিঝুম নিশুতি রাতে নিঃস্তব্ধ বাড়িটার সদররাস্তার অর্গলবদ্ধ কপাটে কে ঘা দেয়? কে এল এই সময়? একটু বেঁকে ভূধরবাবু স্ত্রীর শরীর দেখার চেষ্টা করলেন। নিঃসাড়ে ঘুমুচ্ছে হেমপ্রভা। সারাদিন খাটাখাটুনির পর ঘুমটা গভীর, নিরুদ্বিগ্ন। ঘন শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনে বুঝলেন, হাত দিয়ে না ঠেললে জাগবার সম্ভাবনা নেই। এখুনি তাকে ডাকবেন কি ডাকবেন না ভাবতে ভাবতে মনোযোগে ভূধরবাবু আরো ক'মুহূর্ত শব্দটা শুনলেন। কতক্ষণ ধরে উঠছে কিন্তু কেউ তো সাড়া দিচ্ছে না! একতলার মানুষগুলো কি মরে গেল! সদর দরজার পাশেই তো শশাঙ্ক হাজরার ঘর। হাঁপানির টানে তার বুড়ী মা-টা তো সারারাত জেগেই থাকে—

ভাবতে গিয়ে হঠাৎ যেন ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন ভূধরবাবু। তাঁর সারা শরীর কেঁপে উঠল। ঠিক এইসময় অন্ধকারে কোথাও একটা টিকটিকি কুৎসিত-ভাবে টক-টক করে ডেকে উঠতে এবং খাটের নীচে গোটা তিনেক ইঁদুর এক-সঙ্গে ছুটোছুটি করে হুল্লোড় বাঁধিয়ে বসতে যেন আরো চমকে উঠলেন। তাঁর দুর্বল বয়স্ক হৃৎপিণ্ড অল্প লাফাতে লাগল, হাত-পা কেমন অবসন্ন বোধ হ'ল। পাশ ফিরে হেমপ্রভাকে মৃদু চাপাগলায় ডাকলেন, 'শুনছ, এই···'

হেমপ্রভার কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। অল্পকাল চুপ করে থেকে ভূধরবাবু বিরক্ত ও উত্তেজিত হয়ে বিছানায় পিঠ ঘষে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে স্ত্রীর শরীরে হাত ঠেকালেন, 'এই···'

ঘুমের মধ্যে ধাক্কা খেয়ে কিছু একটা ভেবে হেমপ্রভা গোঁ গোঁ শব্দে গুঙিয়ে পাশ ফিরল। নিঃশব্দ ঘরে গোঙানির শব্দটা এমন বিকৃত অদ্ভুত শোনাল যে ভূধরবাবু আরো বেশী ভয় পেয়ে স্ত্রীর মুখে হাত চাপা দিতে চাইলেন। কিন্তু তাতে আরো জোরে চিৎকার করে উঠতে পারে আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি হাত সরিয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে আবার ডাকলেন, 'শুনছ, এই! ধুত্তোরি ছাই, ওঠো না!'

মনে হ'ল হেমপ্রভা শুনতে পেয়েছে। কেননা এবার স্বাভাবিক গলায় 'উঁ'-জাতীয় একটা কিছু উচ্চারিত হ'ল এবং নিঃশ্বাসপতনের ভারি শব্দ ক্রমশ শিথিল এলোমেলো হয়ে গেল। ভূধরবাবু রুদ্ধশ্বাস চাপাগলায় বললেন, 'কারা দরজা ধাক্কাচ্ছে!'

যেন কথাটা অতিশয় ভয়ঙ্কর, যেন বাইরের পৃথিবীতে ভূমিকম্প শুরু হয়েছে,

অথবা বন্যার জল লাফিয়ে ঘরে উঠে এসেছে, হেমপ্রভার ঘুম মুহূর্তে ছুটে গেল। খুব দ্রুত বিপর্যস্ত ভঙ্গিতে বিছানায় উঠে বসে বলল, 'কারা ধাক্কাচ্ছে? কোন্ দরজা?'

ভূধরবাবু বললেন, 'শ্‌শ্‌শ্, আস্তে।'

হেমপ্রভার মুখ সাদা হয়ে গেল, 'আমাদের দরজা?'

'না, নীচে! ঐ শোন……'

হেমপ্রভা কান পাতল। তার শরীরও অল্প অল্প কাঁপছে। হাত পা অবশ হয়ে আসছে। গলার স্বর আরো খাদে নামিয়ে বলল, 'অনেকক্ষণ থেকে?'

'হ্যাঁ।'

'এইরকম শব্দ…?'

'হ্যাঁ!'

'পুলিশ না তো?'

'পুলিশ!'

'হ্যাঁ, সেবারের মতো……'

বলে অন্ধকারেই ভূধরবাবুর হাঁটুর কাছটা খামচে ধরল হেমপ্রভা। ভূধর-বাবুর সমস্ত রক্তধারা অকস্মাৎ গতি হারিয়ে বরফের মতো শক্ত ও ঠাণ্ডা হয়ে গেল। ঠিক এই কথাই ভাবছিলেন তিনি, এই ভয়ই করছিলেন! এখন স্ত্রীর মুখ থেকে একই আশঙ্কা উচ্চারিত হওয়ামাত্র ভূধরবাবু যেন সমস্ত শক্তি হারিয়ে কাঠের পুতুল হয়ে গেলেন।

সদর-কপাটে করাঘাতের শব্দ প্রবল হয়ে উঠছে। অসহিষ্ণু ক্রুদ্ধ হাতের আঘাত। কেউ যেন চিৎকার করে কিছু বলছে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না।

এত রাত্রে এই বাড়ীর কেউ নিশ্চয়ই বাইরে নেই। থাকার কথা নয়। যা দিনকাল! এখানে কার্ফু, ওখানে ক্যাম্বিং, সেখানে গুলি। সন্ধ্যা হতে না হতে পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ে এক একটা এলাকার উপর। এখানে ওখানে পড়ে থাকে মানুষের মৃতদেহ। ভয়ে উত্তেজনায় সারা শহর সন্ধ্যা থেকেই কাঁপে। রাত দশটা বাজতে না বাজতে শহরের সমস্ত কোলাহল থেমে যায়, ট্রাম-বাসের গতি ঊর্দ্ধশ্বাস পলায়নপর হয়। এই পাড়ার গলিপথগুলো মৃত অজগরের মতো এঁকে বেঁকে নিঃসাড়ে পড়ে থাকে। কদাচিৎ কারো পায়ের শব্দে আশেপাশের বাড়ীর লোকেরা চমকে ওঠে। এই প্রচণ্ড গ্রীষ্মেও দরজা জানালা খুলে শোবার সাহস পায় না কেউ। রাতের দিকে জোরে চেঁচিয়ে মা ছেলের নাম ধরে ডাকতে ভয় পায়।

এই পুরনো ত্রিতল ভাড়া-বাড়ীর খোপে খোপে যারা থাকে তারা দশটা বাজার আগেই ঘরে ঢুকে পড়ে। তার কিছুপরে সদর দরজায় খিল দেওয়া হয়।

এ ব্যবস্থা আগে ছিল না। সারারাত হাট করে খোলা থাকত দরজা। মধ্যরাত পর্যন্ত লোক যাওয়া-আসা করত। অযত্নে অব্যবহারে চওড়া দরজার একটা পাল্লা ভেঙে পড়েছিল, কব্জাগুলো জং ধরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। পাড়ায় গোটা দুই খুন হবার পর বাসিন্দারা ভয় পেয়ে যায়। তারপর তিন নম্বর খুনটা এই বাড়ীর গায়ে গায়ে হওয়ায় ভয়টা রীতিমতো আতঙ্কে পরিণত হয়। নীচের তলার মনোহর পাল দোতলার কম্পাউণ্ডার অনিল দাসকে একদিন ফিসফিস করে বলে, 'রাতে কারা যেন আসে উঠোনে! দাঁড়িয়ে জটলা করে।'

অনিল দাসের মুখ শুকিয়ে ওঠে, 'কারা আসে?'

'কি করে বলব? ভয়ে বেরুই না ঘর থেকে।'

তিনতলার সরোজবাবুর চাকর বৃন্দাবনও বলে, 'সেদিন আমিও দেখেছি! উঠোনে দাঁড়িয়ে কারা কথা বলছিল।'

'খালি হাত?'

'না বাবু! কি যেন ছিল হাতে, বুঝতে পারিনি·····'

শুনে মনোহর ও অনিল দু'জনেরই বুক কাঁপতে থাকে। কথাটা সত্য না মিথ্যা যাচাই করার সময় হয় না। তার আগেই ঘরে ঘরে খবর পৌঁছে যায়। সবাই শোনে, সদর দরজা খোলা পেয়ে গভীর রাতে কারা যেন আসে। উঠোনের বাঁধানো চত্বরে গোল হয়ে বসে শলাপরামর্শ করে। সিগেরেটের লাল আগুনে তাদের চোখ মুখ চক চক করে; তাদের হাতের কাছে শোয়ানো থাকে লম্বা লোহার রড্, বন্দুক, ধারালো তরবারি······

বাসিন্দারা আঁতকে ওঠে, 'কি সর্বনাশ! পুলিশ ঢুকবে ঘরে ঘরে। ঠেঙিয়ে মাথার ঘিলু বের করে দেবে।'

সরোজবাবুর বউ বলে, 'কেন, আমাদের কি দোষ!'

অনিল দাস নীচে থেকে চেঁচায়, 'এখন দোষগুণের বাছাবাছি নেই বৌদি, ওদের ওপর চালাও হুকুম, ধরো আর মারো! বউবাচ্চা মানে না।'

এই বাড়ীর প্রবীণতম মানুষ ভূধরবাবু। আর বছর খানেকের মধ্যে চাকরি থেকে রিটায়ার করবেন। মেয়েদের বিয়ে দিয়েছেন। একমাত্র ছেলেকে অনেক কষ্টে ডাক্তারী পাশ করিয়েছেন। সে এখন মুর্শিদাবাদের এক হেলথ সেণ্টারে কাজ করে। এ বাড়ীর সকলেই ভূধরবাবুকে সমীহ করে। উপদেশ পরামর্শ নিতে আসে। সব শুনে ভূধর বললেন, 'সদর দরজার পাল্লা ঠিক

করুন আপনারা, মজবুত দেখে খিল লাগান। রাত সাড়ে দশটায় খিল এঁটে দেবেন।'

পরামর্শটা মনোমত হয়। বাড়ীর গঠনটা এমন যে বাইরের দরজা বন্ধ করলে ঢুকবার পথ থাকে না। চারদিকে নোনাধরা ইঁটের দেয়াল ছোট ছোট সেকেলে জানালা নিয়ে সোজা খাড়া হয়ে থাকে। এমন কি দরজার ঠিক উপরে সিঁড়ির চাতাল থাকায় ওই দিকটাও নিরাপদ। কারো টপকে আসার জো নেই।

পাল্লা মেরামতের জন্য বাড়ীওলার কাছে তদ্বির চলে। কিন্তু ভাইয়ে ভাইয়ে মামলা বেঁধে বাড়ীর স্বত্ব-স্বামিত্ব এখন রিসিভারের হাতে। কেউ কানে তোলে না। শেষপর্যন্ত ভাড়াটেরাই চাঁদা তুলে নতুন কাঠের পাটা, স্ক্রু, কব্জা, লোহার খিল কিনে আনে। বাড়ীর ভেতরটা ভাঙাচোরা, চুণবালি খসে খসে পড়ে, দমকা হাওয়ায় জানালা কপাট থরথর করে কাঁপে। তা থাকুক, বাইরের দরজাটা শক্তপোক্ত হোক! এখন সময় বড় ভয়ানক। বাইরের গোলমাল যাতে ভেতরে না ঢুকতে পারে তার ব্যবস্থা চাই। নইলে কেউ নিরাপদ নয়।

ঠিক হয়, রাত এগারোটায় বৃন্দাবন দরজা বন্ধ করবে। তারপর শুয়ে থাকবে সিঁড়ির চাতালে। কেউ ডাকাডাকি করলে সে এই বাড়ীরই লোক কিনা ভালো করে জেনে-বুঝে দরজা খুলবে। এর জন্যে প্রতি মাসে সে কিছু পাবে।

কয়েক সপ্তাহ নিরুপদ্রবে কাটে। ইতিমধ্যে পাড়ায় পুলিশের চর সন্দেহে নামকরা একটা দাগী গুণ্ডা খুন হয়ে যায়। তার লাশটা ভাঙা শিব-মন্দিরের কাছে অনেকক্ষণ ধরে পড়ে থাকে। না এ্যাম্বুলেন্স, না পুলিশভ্যান—কেউ নিতে আসে না। ঘণ্টা দুই পরে মিলিটারি এসে ঘিরে ফেলে গোটা পাড়া। শুরু হয়ে যায় কুম্বিং। পাড়ার ছাত্রদের একটা মেসবাড়ী থেকে গোটা কয়েক ছেলেকে ধরে নিয়ে যায় ওরা। পরের দিন চারজনের মৃতদেহ পাওয়া যায় নিকটবর্তী সদর রাস্তার ধারে, ভবানী মিত্তির লেনের গলিতে!

তারও দু'দিন পরে এই বাড়ীর সদর দরজার কড়া সশব্দে বেজে ওঠে। চাতাল থেকে সদ্য ঘুমভাঙা গলায় বৃন্দাবন সাড়া দেয়, 'কে বটে? এত রাতে?'

বাইরে থেকে গালিগালাজের সঙ্গে জবাব আসে, 'তেরে বাপ, শালা জল্‌দি খোল্‌, নেহি তো তোড় দেঙ্গে!'

গলা ও ভাষা শুনে বৃন্দাবন খাড়া হয়ে ওঠে! কি করবে ঠিক করতে

পারে না। উপরের হরিশ সামন্ত মদ গিলে মাঝে মাঝে দরজা ধাক্কায়। খুলতে দেরী হলে খিস্তিখাস্তা শুরু করে, 'কোন্ শুয়োরের বাচ্চা দরজা বন্ধ করেছে, কার হুকুমে বন্ধ করেছে, আমি কি শালা মাগ্না থাকি! আভি খোল্ দরজা।' কিন্তু হরিশের মতো এদের বেহেড্ মাতাল মনে হচ্ছে না। ভারি বুটজুতোর খটখট শব্দ শোনা যাচ্ছে। কাঠের দরজার ফাঁক দিয়ে টর্চের জোরালো আলো ঝিলিক দিচ্ছে। বৃন্দাবন দরজার কাছে এসেও খুলল না। ভয় পেয়ে বোকা বনে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকল।

ইতিমধ্যে দরজায় সবুট পায়ের লাথি আরো ক্রুদ্ধ হয়ে বাজল। টর্চের ঊর্দ্ধমুখী আলো বাড়ীর জানালা-দরজায় হিংস্রভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল। সেই তীব্র পরিষ্কার আলোর সর্বত্র অবাধ সঞ্চরণ দেখে বৃন্দাবন পায়ে পায়ে পিছিয়ে প্রথমে রামদাস পরে মনোহরের দরজায় ঘা দিয়ে বলল, 'বাবু উঠুন, উঠুন শীগ্গির…'

রাতের বেলা রামদাস বালবাচ্চা নিয়ে মড়ার মতো ঘুমোয়। তার সাড়া পাওয়া গেল না। মনোহর দরজা খুলে বাইরে এল, 'কি হয়েছে? কারা?'

বৃন্দাবন বলল, 'পুলিশ! ওই শুনুন বুটজুতোর শব্দ!…দরজা খুলব?'

'খুলবি? তা ইয়ে, খুলে দে। আমরা কি করেছি? আমাদের কি দোষ!'

'তাহলে খুলছি বাবু?'

'হ্যাঁ, খুলে দে! আমরা কি করেছি…'

বৃন্দাবন সাহস পেয়ে দরজা খুলতে গেল। তার পেছনে মনোহর। খিল খোলা মাত্র দরজার একটা পাল্লা বৃন্দাবনের মুখে এসে আছড়ে পড়ল। তার নাকটা এক পাশে বেঁকে গেল, কপালের কিছু অংশ দেখতে দেখতে জামরুলের মতো ফুলে উঠল। মাথা ঘুরে বৃন্দাবন মাটিতে বসে পড়বার আগে তলপেটে আর একটা সদর্প লাথি এসে তাকে শুইয়ে দিল। কাণ্ড দেখে মনোহর ছুটে ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল, 'শালা এতক্ষণ দরজা খুলতে কি হচ্ছিল'— বলে কে যেন রাইফেলের বাঁট দিয়ে মাথায় মারল। টর্চের ঝলসানো আলোতে মনোহর নিজের ক্ষতস্থানের রক্ত নিজেই টপটপ করে ঝরতে দেখল।

তারপর সারা বাড়ীর ঘর বারান্দা জুড়ে যেন তাণ্ডব শুরু হয়ে গেল। কেউ কিছু ভাল করে বোঝার আগেই উদ্যত রাইফেল আর জোরালো টর্চের মুখোমুখি চোখ বন্ধ করে হাত উপরে তুলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল। মেয়ে-বউরা খোলামেলা হয়ে শুয়েছিল, জেগে উঠে শাড়ী-সায়া গুছিয়ে নিতে ভুলে গেল। নিবারণের পিসী বাচ্চার মুখ শক্ত হাতে চেপে ধরে কান্না বন্ধ

করতে চাইল। শ্বাসরুদ্ধ হয়ে নীলবর্ণ মুখে বাচ্চাটা প্রায় শক্ত হয়ে গেল! বুট জুতোর লাথি খেয়ে নীলমণির বেড়ালটা দোতলা থেকে সটান উঠোনে ছিটকে পড়ল। তিনতলার একটা পাখির খাঁচাও উঠোনে ছিটকে পড়ায় পাখিটা বিকট আর্তনাদ শুরু করল।

আরো কয়েক মুহূর্ত পরে তিনতলার ভুবনমাস্টারের ঘর থেকে তার বড় ছেলেকে ওরা চুলের মুঠি ধরে টেনে বের করল। ভুবন বাধা দিতে গিয়ে ধাক্কা খেয়ে এক পাশে ছিটকে পড়লেন। তার স্ত্রী বাইরে বেরুতেই পারল না, কে যেন ঠেলে ভেতরে ঢুকিয়ে দরজার শেকল তুলে দিল। আর্ত চিৎকারের সঙ্গে বন্ধ-কপাটে মাথা কুটতে কুটতে সে যখন জ্ঞান হারাল, তখন ভীত বিবর্ণ একরাশ মানুষের মধ্যে দিয়ে পশুকে বধ্যভূমিতে টেনে নেওয়ার মতো নিষ্ঠুর পৈশাচিক উল্লাসে কুড়ি-বাইশ বছরের ছেলেটাকে টানতে টানতে ওরা সদর্পে বাড়ীর বাইরে চলে গেল।

তারপর সেই ভয়ঙ্কর রাত্রির প্রভাতে এই বাড়ী থেকে মাইলখানেক দক্ষিণে একটা মাঠ ও পুকুরের মধ্যবর্তী জায়গায় আরো একটি সমবয়স্ক মৃতদেহের সঙ্গে এই ছেলেটিরও গুলিবিদ্ধ প্রাণহীন দেহ আবিষ্কৃত হ'ল।

ক'দিন ধরে বাড়ীটা শোকে-দুঃখে ভয়ে-বেদনায় স্তব্ধ বিমূঢ় হয়ে থাকল। রেডিওতে প্রাত্যহিক খবর ছাড়া গান বাজল না। সন্ধ্যারাতে শশাঙ্কর ঘরে তাসের আসর বসল না। মনোহর একটু খরচ করে ছেলের মুখে ভাত দেবে ভেবেছিল, দিনটা পিছিয়ে দিল। সরোজবাবু তাঁর বড় ছেলেকে মামার বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন। ভূধরবাবুর পুরনো বুকের ব্যথা ভীষণ বেড়ে যাওয়ায় অফিস থেকে ক'দিন ছুটি নিলেন। ছেলেকে চিঠি দিতে গিয়েও দিলেন না। যদি চলে আসে!

দিনের বেলায় তেমন সাড়াশব্দ নেই কিন্তু রাত্রির দিকে ভুবনমাস্টারের স্ত্রীর কান্নার শব্দ কখনো নিম্নগ্রামে কখনো উঁচুপর্দায় এই বাড়ীর ইটকাঠদরজা জানালাআসবাবপত্র ছুঁয়ে যেতে লাগল। একটা সকরুণ বিষণ্ণতা ঘরে ঘরে সংক্রামিত হয়ে গেল। কান্নাটা না-থামা পর্যন্ত ভূধরবাবু ক'দিন কিছুতেই ঘুমোতে পারলেন না। হেমপ্রভার চোখেও জল ছলছল করতে লাগল।

বৃন্দাবন জানাল, সে আর নীচে শোবে না। পাঁচ কেন পঞ্চাশ দিলেও না। জীবনের চেয়ে টাকা কি বড়! উপায় থাকলে সে এখানকার কাজ ছেড়ে গাঁয়ে ফিরে যেত—এখানে প্রাণের কোনো দাম নেই।

শেষপর্যন্ত ভূধরবাবুর মধ্যস্থতায় ঠিক হ'ল, শশাঙ্ক দরজা বন্ধ করে ঘুমোতে

যাবে। রাতে কেউ ডাকাডাকি করলে যার ঘরের লোক সে দরজা খুলে দেবে। অন্য কেউ উঠবে না।

কিন্তু রাত এগারোটার পর এ-বাড়ীর কোনো লোক বাইরে থাকল না। এমন কি বদ্ধ মাতাল হরিশও দশটার মধ্যে ঘরে ফিরে কিছুক্ষণ আপন মনে চেঁচিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে লাগল। শশাঙ্কর প্রতিবেশী বিষ্টু তিন নম্বর শিফ্‌টের কাজ শেষ করে বাকি রাতটুকু কারখানাতেই শুয়ে কাটিয়ে দিতে লাগল। বাসিন্দারা বন্ধ দরজার অন্তরালে ঘুমের মধ্যে কখনো বোমা বা ক্র্যাকার, কখনও রাইফেলের গুলি ফাটার প্রচণ্ড শব্দে বউছেলেমেয়েসহ চমকে জেগে উঠে শব্দটা বাড়ীর কত কাছাকাছি তার হিসাব শুরু করল। তারপর কয়েকমুহূর্ত নিঃশব্দ নির্বাক থেকে যখন বুঝল এ-বাড়ীর দরজার কাছে এখনও দলবদ্ধ ভারি বুটজুতোর শব্দ উঠছে না বা কড়া ধরে কেউ বেপরোয়া খট্‌খট্‌ শব্দ তুলছে না—তখন অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত হয়ে অথচ বুকের গভীরে সন্দেহজনক একটা আতঙ্ক গোপন রেখে আবার ঘুমিয়ে পড়তে চাইল। ওই দরজাটা তাদের নিরাপত্তার পক্ষে মোটেই নিরাপদ নয়—অভিজ্ঞতায় তা জানার পরেও কেমন অসহায় দুর্বলভাবে ওরই উপর নির্ভর করে মানসিক স্বস্তি খুঁজতে চাইল!

······বেশ কিছুদিন পরে দরজার কড়া আবার নড়ে উঠেছে। জীর্ণ বাড়ীটার ঘরে ঘরে তার প্রতিধ্বনি। হয়ত সবাই জেগেছে, শুনেছে, কিন্তু কোথাও কিছুমাত্র সাড়া নেই। গভীর রাতে গোটা বাড়ীটা যেন আরো বেশী ঠাণ্ডা, আরো নিঃশব্দ হয়ে গেছে। শুধু সেই প্রাণহীন শীতলতার বুকে থেকে থেকে ধাতব শব্দের ঝঙ্কার শোনা যাচ্ছে···

ভূধরবাবু চাপাগলায় বললেন, 'আলোটা জ্বালাই?'

হেমপ্রভা বাধা দিল, 'না, কি দরকার!'

'ঘড়িটা দেখতাম।'

'কি হবে? চুপ করে থাক, কথা বলো না।'

ভূধরবাবু চুপ করে গেলেন। ······কোথায় যেন একটা কুকুর ডাকছে। রুগ্নশিশুর কান্নার মতো কেমন কাঁপাকাঁপা গলা! গভীর রাতে এমন করে কুকুর-বেড়ালের কান্না ভাল নয়। গ্রামে মড়ক লাগে, শহরে দুর্ভিক্ষ আসে, যে-গৃহস্থ শোনে তার অমঙ্গল হয়। ভূধরবাবুর বুকের ভেতর যেন একটা ঝড় বইতে লাগল। স্নায়ুর ওপর অসম্ভব চাপ পড়ছে। কপালের

শিরাগুলো দপ্ দপ্ করছে। গলা শুকিয়ে কাঠ। হেমপ্রভাকে একটু জল দিতে বলবেন সে সাহসও নেই। তাহলে সুইচ টিপে আলো জ্বালতে হবে, কুঁজোয় গ্লাসে ঠনঠন শব্দ হবে। এখন এই মুহূর্তে তারা কেউ আলো জ্বালতে চায় না, বাইরের শব্দ কান পেতে শোনা ছাড়া অন্য কোনো শব্দ তুলতে চায় না। সেবার মাতাল হরিশের ঘরে আলো জ্বলতে দেখেই তো বেদম পিটিয়েছিল ওকে। সে না-কি জেগে ছিল, তবু দরজা খোলেনি। মাতালেরা তো মাতাল চেনে না!

একটানা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর হেমপ্রভা আবার ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'কেউ তো সাড়া দিচ্ছে না!'

ভূধরবাবু বললেন, 'কে দেবে?'

'ওরা দরজা ভেঙে ঢুকবে।'

'ভেঙে?'

'হ্যাঁ!'

দু'জনেই আবার চুপ করে গেল। সেবারের কথা নতুন করে মনে পড়ল। বিশেষ করে ভুবনমাস্টারের ছেলের কথা। মাঠ থেকে কুড়িয়ে লাশটা আনা হয়েছিল বাড়ীতে। বীভৎস ক্ষত-বিক্ষত দেহ। কেউ যেন সাঁড়াশী দিয়ে গায়ের মাংস ছিঁড়ে নিয়েছে, মাথার চুলগুলো টেনে টেনে ছিঁড়েছে, একটা চোখ উপড়ে ফেলেছে। তার ওপর বুক জুড়ে দগ্‌দগে গুলির চিহ্ন! মৃতদেহ দেখে ভূধরবাবু মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিলেন। মনোহর তাঁকে ধরে উপরে নিয়ে আসে।

ভূধরবাবু আজও জানেন না ছেলেটা কেন মরল, তার অপরাধ কি! কানাঘুষোয় অবশ্য নানাকথা শুনেছেন। তবে এ বাড়ীর সকলেরই সন্দেহ, ছেলেটার সঙ্গে না-কি তাদের যোগাযোগ ছিল যারা বন্দুক কেড়ে বেড়ায়, জোতদার-জমিদার-পুলিশ খুন করে। মাস দুই আগে সে-যে একমাসের জন্য নিখোঁজ হয়েছিল এবং ইদানীং সে যে প্রায়ই রাত্রে ঘরে থাকত না, এ কথাটাও প্রথম জানলেন ভূধরবাবু। ভুবনবাবু অবশ্য বাড়ী ছেড়ে যাবার আগের দিনও বলে গেছেন, তাঁর ছেলে নির্দোষ, নিরপরাধ, শুধু সন্দেহের বশে……

আসল সত্য কেউ জানে না। ভুবনমাস্টারও জানেন না। সবই অনুমান, শোনা কথা। আদালতে বিচার হলে হয়ত কিছু বোঝা যেত, জানা যেত। কিন্তু তা তো হ'ল না। সাক্ষীসাবুদে দলিলেপত্রে তাকে তো অভিযুক্ত করা হ'ল না। বিনা প্রমাণে বিনা বিচারে একটা তরতাজা ছেলে খুন হয়ে

গেল। আর হ'ল তাদেরই হাতে অভিযোগ এনে আদালতে প্রমাণ করার দায়িত্ব যাদের ওপর। এটা কেমন করে হ'ল? কেন হ'ল?

ছেলেটা মরার পর থেকে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন ভূধরবাবু। কিছুতেই পাওয়া যাচ্ছে না। আর না-পেয়ে এই শেষবয়সে থানাপুলিশ সম্পর্কে কেমন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছেন তিনি। রাইফেল-হাতে ওদের কাউকে কোথাও দেখা মাত্র কেমন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন। নাগরিক হিসেবে ওদেরই হাতে তাঁর জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা—কথাটা কিছুতেই বিশ্বাস করে উঠতে পারছেন না। এক একটা রাইফেলধারী পুলিশকে এক একটা জীবন্ত ঘাতক বলে মনে হচ্ছে তাঁর!

না-হলে পুলিশের নাম শুনে ভয় পাবেন এমন মানুষ তিনি ন'ন। এক সময় তাঁর চার মামার দুই মামা টেররিস্ট দলের সদস্য ছিলেন। কথায় কথায় ইংরেজের পুলিশ ঢুকত বাসায়। বড়মামাকে কোনোদিন ধরতে পারেনি। সেজমামা ধরা পড়েছিলেন। তিন বছর ধরে আদালতে বিচার হয়েছিল। বিচারে দশ বছর জেলও হয়েছিল। কিন্তু রাজবন্দীর সম্মান পেয়েছিলেন সেজমামা। এখনও জীবিত আছেন। মাস গেলে ক'টাকা যেন বিপ্লবীভাতা পান। মাঝে মাঝে সেটা বন্ধ হয়ে গেলে তদ্বির-তদারকের জন্য ভূধরবাবুকে চিঠি দেন। শৈশবে অনেক দিন মামাদের বাসায় কাটিয়েছেন ভূধরবাবু। বিচারের সময় আদালতে গেছেন দু'একবার। তখন তো দেশটা পরাধীন ছিল! এখন এদেশে কি ভয়ঙ্কর নিয়ম চালু হ'ল? বিচার নেই, প্রমাণ নেই, শুধু সন্দেহের বশে, ইচ্ছে হলেই……

সেই কুকুরটা এখনও কাঁদছে। কি কর্কশ করুণ কণ্ঠস্বর! শহরে-গ্রামে একটা মড়ক-মহামারী কি আসন্ন? একটা ভয়ঙ্কর কোনো পরিবর্তন!

দরজায় এখন ক্রুদ্ধ লাথি পড়ছে। ওরা কি ভেঙে ফেলবে? একটা মানুষও উঠবে না? সত্যি সত্যি যদি দরজা ভেঙে ঢোকে…একতলা দোতলা পার হয়ে দলবেঁধে এই তিনতলায় উঠে আসে…

ভাবতে গিয়ে ভূধরবাবুর শিরা-উপশিরা ঝনঝন করে বেজে উঠল। নিজের ঘরের অর্গলবদ্ধ দরজার দিকে বিপর্যস্ত দৃষ্টিতে তাকালেন তিনি। অন্ধকারে কিছু দেখা গেল না বলে চোখ জ্বালা করে উঠল। মাথায় একটা অদ্ভুত যন্ত্রণা হতে লাগল। অনেকক্ষণ ধরে ক্রমাগত ভয় পেতে পেতে এখন ভয়ের অনুভূতিটাই যেন ভোঁতা হয়ে গেল। তাঁর মনে হ'ল, কুকুরের কর্কশ কান্নার সঙ্গে দরজার প্রবল করাঘাতের শব্দ মিলেমিশে এই ঘরের বায়ুমণ্ডলে একটা

ভয়ঙ্কর ধ্বনিবৃত্তের সৃষ্টি হয়েছে। সেই ভয়ঙ্কর শব্দায়মান বৃত্তটা ক্রমশ ছোট হতে হতে হেমপ্রভাসহ তাঁকে গ্রাস করার জন্য ছুটে আসছে। গোলাকার ঘূর্ণি ঝড়ের মতো।

অনেকটা আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে ভূধরবাবু শরীরটা শক্ত করে ফেললেন। দু'হাত মুঠো করে আবার খুলে দিলেন। তারপর সহসা বিছানা থেকে লাফিয়ে নামলেন নীচে। সুইচবোর্ডে হাত দিয়ে আলো জ্বালিয়ে ফেললেন। হেমপ্রভা ভয় পেয়ে চাপাগলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'এ কি করছ! নেবাও শীগ্গির নেবাও......'

ভূধরবাবু উত্তর দিলেন না। একবার স্ত্রীর ভয়ার্ত মুখের দিকে তাকিয়ে সারা ঘরময় পরিব্যাপ্ত পরিষ্কার উজ্জ্বল আলোর ছটা দেখলেন। তারপর আবার কান পেতে শুনলেন সেই শব্দটা......

এখনও কি কেউ শোনেনি? ঘরে ঘরে সব মানুষ কি বোবা-কালা? সবাই কেন একসঙ্গে উঠে দরজা খুলে মুখোমুখি দাঁড়াচ্ছে না? সে'বার সবাই যদি একসঙ্গে দাঁড়াত, যদি ঘরে ঘরে বাতি নিবিয়ে খিল দিয়ে কাপুরুষের মতো লুকিয়ে না থাকত, সবাই যদি একজোট হয়ে ছেলেটার সঙ্গে সঙ্গে থানায় যেত, প্রমাণপত্র দাবি করত, আদালতে মামলা তুলতে বলত, তাহলে কি প্রাণে বাঁচত না? মরত অমন করে? অন্তত সব জানাজানি তো হত!

আজ কপাটে করাঘাত কার জন্য? কার ছেলেকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যেতে এসেছে ওরা? কোন্ ঘরের? কোন্ মায়ের?

ভুবনমাস্টারের ছেলের মুখটা মনে পড়ল আবার। সঙ্গে সঙ্গে নিজের ছেলের। দেয়ালের দিকে তাকালেন ভূধর। ফ্রেমে বাঁধানো অমলের ছবি। কনভোকেসনের কালো পোষাক পরণে, হাতে গোল-করে-ধরা সার্টিফিকেট। মুখখানা কচিকাঁচা, টলটলে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে যেন ভুবনমাস্টারের বউয়ের কান্না শুনলেন, 'ওরা আমার কি সর্বনাশ করে গেল গো...'

ভূধরবাবু শক্ত সবল হাতে নিজের ঘরের দরজা খুললেন। বিছানা থেকে নেমে আসতে আসতে হেমপ্রভা কি যেন বলল, শুনতে পেলেন না। দরজার খিলটা হাতে নিয়েই বাইরের বারান্দায় এসে অস্থির উত্তেজিত গলায় চেঁচিয়ে ডাক দিলেন, 'কে দরজা ধাক্কায়? কে? আমি ভূধর বলছি, ওঠো দেখি তোমরা, ওঠো সব......'

মৃগয়া

দোকানের কাছাকাছি এসে গাড়ীটা সত্যি-সত্যি খারাপ হয়ে গেল দেখে গোপাল খুশি হ'ল। বলাই মোড়ল আর ওর মুনিষ দু'জনকে চা করে দিতে দিতে কালোরঙের ছোট গাড়ীটার ওপর নজর রাখল। ওর মনে হ'ল সকালের দিকে এই গাড়ীটাকেই যেন মশানজোড়ের দিকে যেতে দেখেছে! তাহলে কোলকাতার বাবুরা কেউ আছে নিশ্চয়। এই পথে হরদম গাড়ী যায় এখন। মশানজোড় যায়, দুমকা যায়, দেওঘর যায়। কোলকাতার বাবুরা গাড়ী নিয়ে আসে। বোলপুর কিংবা সিউড়ির হোটেলে থাকে। ঘুরে ঘুরে দেখে বক্রেশ্বর, তারাপীঠ, তিলপাড়া, জয়দেব-কেঁদুলী। ফেরার পথে শান্তি-নিকেতন-শ্রীনিকেতন দেখে যায়।

গোপালের দোকান মশানজোড় আর মামুদবাজারের মাঝামাঝি। রাস্তার বাঁ দিকে পুরনো বটগাছের তলায় মাটির দেয়ালের উপর খড়ের চালা। জলে-ধুলোয় বিবর্ণ-হয়ে-যাওয়া একটা তক্তাপোষ। তার চারটে পায়ার দুটো অচল, ইঁট সাজিয়ে ঠেকা-দেওযা। সামনের দিকটায় কাঁচের বোয়েমে লেড়ু নিমকি আর নানখাটাই বিস্কুট। তেলচিটে ঝুড়িতে পেঁয়াজি বেগুনি আলুর চপ। সবুজ-রঙা একটা টিনে মুড়ি, তারের ঝুড়িতে কটা হাঁসের ডিম। দোকানের ডাইনে-বাঁয়ে ক্রোশ খানেকের মধ্যে কোনো গ্রাম নেই। চারিদিকে ধূ ধূ ধান ক্ষেত। রাস্তার দক্ষিণে বনবিভাগের এলাকা। অনেকখানি জায়গা জুড়ে ঘন শালবন। সোজা সরল শালগাছের ফাঁকে ফাঁকে মহুয়া, পলাশ আর যজ্ঞডুমুরের গাছ। এই এলাকায় দোকান বলতে এই একটাই। যা কিছু বিক্রিবাট্টা ধান-কাটা আর ধান-বোনার মরশুমে। দু'পাশের জমি তখন চাষী আর মুনিষ মাহিন্দারে ভরে থাকে। চাষ দেখতে শহুরে বাবুরাও কখনো-সখনো আসে। আর সিউড়ি কি দুমকার বাসযাত্রীরা দূর-গাঁ থেকে এসে বটতলায় বিশ্রাম নেবার সময় এটা ওটা খায়। সব মিলিয়ে দিনে পাঁচ-সাত টাকার বেশী বিক্রি হয় না গোপালের। এ কারণে শহর থেকে বিড়ির পাতা আর মশলা

এনে সারাদিন তাকে পা ছড়িয়ে বিড়ি বাঁধতে হয়। মামুদবাজারের খড়ি-মাটির কারখানায় গোপালের বিড়ির সুনাম আছে। সপ্তাহে দু'বার হাজার তিনেক বিড়ি সে দিয়ে আসে দোকানগুলোতে। চারজনের সংসার টেনে টুনে চলে যায়।

তার দোকানের আশেপাশে গাড়ী খারাপ হলে সে খুব খুশি হয়। একবার পেট-পিঠ বোঝাই দেওঘরের বাস খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আর একবার মুড়ির টিনের মত বেঢপ সেই সিউড়ির বাসটা। দু'দিনই দোকান খালি করে চড়া দামে সব বিক্রি করেছিল গোপাল। অনেক লাভ করেছিল। সেই থেকে কেমন লোভে পড়েছে। রাস্তায় বাস যেতে দেখলেই চোখ বড় বড় করে তাকায়। ইঞ্জিনের শব্দে কোন গোলমাল আছে কিনা মন দিয়ে লক্ষ্য করে। তারপর খুব করুণভাবে প্রার্থনা করে, 'যা মানিক যা, বিগড়ে যা মাইরি টুকচি!' বাসটা দ্রুতবেগে অদৃশ্য হয়ে গেলে রাগে গরগর করে, 'ইঃ, শালা ছুইটছে দেখ খেপা মোষের পারা! যাবি কদ্দূরকে? পাহাড়ের গায়ে টোক্কর না খেয়েছিস ত কি বললাম!'

আজ অনেকদিন পরে এই গাড়িটা বুঝি পাওয়া গেল! লোক-বোঝাই বাস হলে গোপালের মেজাজটা যে পরিমাণ ফুরফুরে হয়ে উঠত সে-রকম কিছু না হলেও সে মোটামুটি খুশি হয়ে দেখল, ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে এসেছে। সামনের ঢাকনা তুলে নীচু হয়ে যন্তরপাতি দেখছে। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়েছে একজন। ফর্সা ঘাড়, কাঁচা পাকা চুল, চোখে চশমা আছে মনে হচ্ছে। তার পাশে একটা মোটাসোটা মেয়েমানুষ; গোটা দুই ছেলে মেয়ে। মাত্র এই ক'জন অথবা গাড়ীর ভিতর আরো কেউ ঘাপটি মেরে আছে ঠিকমত বুঝতে না পেরে গোপাল মন খারাপ করল।

বলাই মোড়ল আর ওর মুনিষ দু'জন চা খেতে খেতে গাড়ী দেখছিল। অনেকক্ষণ পার হয়ে গেল তবু স্টার্ট নিচ্ছে না দেখে একজন শব্দ করে হাসল, 'ই শালার তেল ফুরাইন্‌ছে গো মোড়ল!'

অন্য জনা বলল, 'চল হে লবীন্, ইবার উয়াকে ঠেইল্‌তে হবে!'

বলাই মোড়ল বিজ্ঞের মত জবাব দিল, 'ই-সব কলের গাড়ীর অই ত মজা বটে হে! চইল্‌ছে ত চইল্‌ছে—এক রাত্তিরে দিল্লী বোম্বাই। কিন্তুক একবার বিগ্‌ড়াইন্ গেল কি মাঝরাস্তাতে চিত্তির! লাও—লড়াও ইবার উয়াকে! দেখি কেমুন ক্ষেম্‌তা! এখুন বাবুমশয়রা হাঁটা ধরেন গো—'

চা খাওয়া হয়ে গেলে গাড়ী দেখতে দেখতে ওরা মাঠে নেমে গেল। এখন

চাষের সময়। কাল রাতে বৃষ্টি হয়েছে খুব। মাঠে লাঙল নেমেছে। বসার উপায় নেই। ওরা চলে গেলে গোপাল উনুনে কয়লা দিল। দোকানে আর কোনো খদ্দের নেই দেখে বিড়ি বাঁধতে বসবে কিনা ভাবতে ভাবতে গাড়ীর দিকে তাকাল। সেই বাবুটি এবার নেমে এসেছে। গোপাল দেখল, দিব্যি লম্বা-চওড়া শরীর, বয়স হলেও মজবুত গড়ন। পাঞ্জাবির হাত গিলে করা, কনুই পর্যন্ত গুটানো। অল্প দূর থেকেও গোপাল স্পষ্ট দেখল, হাত ভর্তি ঘন পিঙ্গল বর্ণের কোঁকড়ান লোম, চওড়া কব্জি, মোটা মোটা আঙুল সমেত প্রকাণ্ড থাবা। সোনা রঙের একটা ঘড়ি রোদ্দুরে চিক চিক করছে। বাবুটি ড্রাইভারের কাছে গিয়ে খোঁজ খবর করছে। গোপাল কথাবার্তাগুলো শুনতে পেল না। সে দোকান থেকে বাইরে এল। বটতলায় একটা জীর্ণ বেঞ্চি পাতা। গোপাল বেঞ্চিতে বসল।

এইসময় গাড়ীর উল্টো দিকের দরজা খুলে প্রথমে গোলগাল একটা ছেলে, পরে পেটেপিঠেবুকে সমান চৌকো সাইজের একটা মেয়ে এবং অবশেষে প্রকাণ্ড গুড়ের জালার মত বেঢপ মোটা সেই মেয়েমানুষটা রাস্তায় নামল। ওরা সবাই মিলে একটা ছোটখাটো কলরব তুলে বাবুটিকে ঘিরে দাঁড়াল। সমগ্র পরিবারটার উপর এক ঝলক চোখ বুলিয়েই গোপাল বুঝতে পারল, বংশটা বড় বটে! কেননা সকলের গায়ের রং এমন উজ্জ্বল, সর্বাঙ্গে থরে থরে সাজানো মাংসের এমন বিপুল সমাবেশ, পোষাক-আশাকের এমন বাহারে চেকনাই, হাত গলা-কান থেকে বিচ্ছুরিত সোনার এমন চকচকে চিকন ঝিলিক—এ সবকিছু আর সাধারণ মানুষের লক্ষণ না! 'বাবুমশয়দের বাড়ীটো কুথা বটে গো!' নিজের মনে প্রশ্ন করে অল্প হেসে নিজেই উত্তর দিল গোপাল, 'বালিগনজঅ বটে গো, বালিগনজঅ।' গোপাল জীবনে কখনো কোলকাতায় যায় নি। কিন্তু খড়ি-মাটির কারখানায় সে শুনেছে, কোলকাতার বালিগঞ্জে ধনেমানে সেরা বড়লোকের বাস। তাদের সাততলা-দশতলা বাড়ী, দশ বিশটা ঝি চাকর, গণ্ডা খানেক গাড়ী। বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা সব সাহেবের মত ইংরেজি বলে। বাবুরা বউদের সঙ্গে বসে মদ খায়। বেড়াতে বেরুলে সঙ্গে থাকে দুধের মত সাদা লোমওলা সাহেবি কুকুর! গোপাল শব্দ করে দেশলাই জ্বালিয়ে বিড়ি ধরাল। তারপর চোখ বড় বড় করে এই গাড়ী থেকে কোনো বিলেতি কুকুর লাফিয়ে নামে কিনা লক্ষ্য করল। কয়েক সেকেণ্ড পার হলে সে আবার বেঁটে-খাটো মেয়েমানুষটার ধবধবে সাদা মাংসল শরীর দেখল। 'কি মুটকিরে বাবা। মাগীর বাড়্গদ্দান চিনতেই লারছি। শালীরা এমুন যে কি করে মুটায় মাইরি!' ঠোঁট ফাঁক করে হাসতে গিয়েও

গোপাল গম্ভীর হয়ে গেল। মনের মধ্যে কেমন একটা লোভ, জ্বালা, ঈর্ষা, বেদনা। ওর চোখের দৃষ্টিতেও এইভাবটা কিছুক্ষণ স্থির হয়ে থাকল। অথচ কেন এমন হ'ল, গোপাল ঠিক বুঝল না। একজনের গায়েগতরে তাল তাল মাংস উপচে পড়লে তার কি, তাতে তার রাগ হবে কেন, ঈর্ষা হবে কেন! বরং ব্যাপারটা তো মজারই, গোপাল ভাবতে চাইল। কিন্তু মনটা তাতে শান্ত হল না। বিড়িটা তেতো লাগল। সে ক'পা হেঁটে গাড়ীটার কাছে একটু খোঁজখবর নিতে যাবে ভাবছিল, আর উৎসাহ পেল না। কিন্তু মনে মনে বলল, 'হেই মা কালী, গাড়ীটো হুস্ করে যেন সারাই না হয়ে যায়! বাবুরা যেন একটুকুন পায়ের ধুলো দেয় আমার দুকানে…'

ইতিমধ্যে ড্রাইভার ইঞ্জিন থেকে মুখ তুলে সোজা হয়ে দাঁড়াল। গোপালের বুকটা দুলে উঠল। গেল বুঝি শালা ফসকে! কিন্তু না, এখনও ঠিক হয় নি। ড্রাইভার গাড়ীর পিছন দিককার ঢাকনা খুলেছে। রকমারি যন্তরপাতি বার করছে। হেই মা কালী…গোপাল আবার শব্দ করে নিবে যাওয়া বিড়িতে আগুন দিল।

চৌকো আর গোলাকৃতি ছেলে-মেয়ে দুটো রোদ থেকে সরে একটা গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়েছে। বাবুটি ইতিউতি তাকাচ্ছে। আর সেই বিশাল ভারি মাংস-পিণ্ডটা রুমাল দিয়ে ঘাড়গলার ঘাম মুছছে। রোদের আভায় মোটা সোনার বালাটা চিক চিক করছে। এইরকম এক একটা বালায় কি পরিমাণ সোনা থাকে, আর তার দামই বা কত কিংবা এ সবই নকল সোনা কিনা ভাবতে গিয়ে গোপালের হঠাৎ মনে হ'ল, এদের গা-গতরগুলো যেমন, খায়ও তেমনি নিশ্চয়। দোকানে একবার এলে ডজনখানেক পাউরুটি আর এক গামলা আলুর দম নির্ঘাৎ উঠে যাবে।……কিন্তু এখনো আসছে না কেন!

গোঁ গোঁ শব্দে এইসময় একটা বাস চলে গেল সিউড়ির দিকে। দরজায় ঝুঁকে অনেকক্ষণ ধরে কণ্ডাকটর এই খারাপ-হয়ে-যাওয়া গাড়ীটা দেখল। তারপর হাসির ভঙ্গিতে দাঁত বের করে চেঁচিয়ে গেল, 'চলে আসুন বাবু—মামুদবাজার—সিউড়ি!' গোপাল মনে মনে বাসটাকে খিস্তি করল। একটুপরে মালবোঝাই একটা ট্রাক গেল দুমকার দিকে। কাল বৃষ্টি হয়েছে বলে ভেজা রাস্তায় ধুলো উড়ল না। তবু বৌ ছেলেমেয়ে সবাই আবারও নাকে রুমাল চাপা দিল দেখে গোপাল হাসল!

তারপর একটু একটু করে অনেকখানি সময় পার হয়ে গেল। মাঠ থেকে কাদা পায়ে সাঁওতাল মুনিষেরা উঠে এল। জলে ভিজিয়ে মুড়ি ফুলুরি খেয়ে

চলেও গেল। হাসনাপুরের রহিম আর ইকবাল এল, মাধাইপুরের লোটন, মতি আর মতির-বউ এল। আলুর চপে কামড় বসাতে বসাতে গাড়ীটাকে নিয়ে ঠাট্টা করল, হঠাৎ ঝড়বৃষ্টি এসে গেলে ছেলেমেয়ে সমেত ওদের কি পরিমাণ দুর্গতি হবে ভেবে দুশ্চিন্তায় মুখ গম্ভীর করে ফের মাঠের কাজে নেমে গেল। গোপালের সমবয়সী কেউ কেউ চা খেতে খেতে মোটা মেয়েমানুষটার উপর চোখ রেখে হাসাহাসি করল, চৌকো সাইজের মেয়েটাকে নিয়ে একটুআধটু ইতর রসিকতাও করল। যাবার সময় গাড়ির গা ঘেঁষে হাঁ করে মেয়েমানুষটার ঘাড় গলা বুকের দিকে তাকাতে তাকাতে মাঠে নেমে গেল।

আর গোপাল বাইরে এসে দেখল সূর্য পশ্চিমে ঢলেছে। জলে-ধোয়া চিকন শালপাতায় নরম রোদ। যজ্ঞডুমুরের ডালে শালিখ চড়ুইরা কিচকিচ করছে। তার দোকানে বটগাছের ছায়া ঘন হয়েছে। গাড়ির ছাদে রোদের রঙটা ধূলোতে-বালিতে বাদামী মনে হচ্ছে। ড্রাইভার এখন গাড়ির নীচে আধখানা শরীর ঢুকিয়ে মাটিতে শুয়ে। ছেলে-মেয়ে দুটো হাঁ করে মাঠের চাষ দেখছে। বাবুটি হতাশ ভঙ্গিতে চশমার কাঁচ মুছছে। মহিলাটি বাইরে পা ঝুলিয়ে পিছনের সীটে এলিয়ে আছে।

না, এদিকে আসবার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না ত! ওরা বোধহয় আর এল না। অধৈর্য গোপাল যথেষ্ট বিরক্ত হয়ে বিড় বিড় করল, 'শালা, তুমাদের ভারি ডাঁট বটে! কাঁচাপয়সা আর হাওয়া-গাড়ির ডাঁট! আমাদের গাঁ ঘরের দুকানে এসে টুকচি চা খেতে তুমাদের অরুচি ধরে, সম্মানে লাগে। রাতভর শালোরা থাক এখুন রাস্তায়, আর ত বাস নাই যি সিউড়ি ঘুরে যাবে!' বেঞ্চিতে পা ছড়িয়ে দিয়ে আবার ফস্ করে একটা বিড়ি ধরাল গোপাল। ওর মনটা রাগে চিন চিন করে পুড়ছিল। মুখটা কালো দেখাচ্ছিল। বস্তুত ওদের না আসাটাকে সে মস্তবড় একটা অপমান বলেই মনে করছিল।

কিন্তু না, গোপালকে আর বেশীক্ষণ বসতে হ'ল না। একটু পরেই বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে লাফিয়ে উঠল সে। ওর মুখের রেখাগুলো নরম হয়ে আসায় গর্তে ঢোকা চোখের ফ্যাকাশে মণিদুটো সামান্য উজ্জল দেখাল। আসছে……ওই ত বাবুরা আসছে! একটা হৃষ্টপুষ্ট লোমওলা শরীর, মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, চোখে ঘন-জোড়া-ভুরুর নীচে মোটাডাঁটির চশমা, লম্বা লম্বা আঙুল সমেত এক জোড়া প্রকাণ্ড মজবুত থাবা! তার পাশে বেঢপ গুড়ের জালার মত সেই মেয়েমানুষটা! তার গায়ের ফর্সা রং পড়ন্ত রোদ্দুরে টকটকে। মাংসের থাকগুলো এখন থলথলিয়ে উঠছে বলে হাত-গলা-

কানের দুল হার বালাও চকমকিয়ে উঠছে। পেছনে গুটি গুটি পায়ে গড়ানো দুটো বৃহৎ চালকুমড়ার মত, দুটো ছেলে-মেয়ে। হাত দিয়ে ঝেড়ে তাড়াতাড়ি বেঞ্চিটা সাফসুফ করল গোপাল। নিজের মনেই শব্দ করে হাসল, 'শালো, ইবারে কেমুন হ'ল : বুলছি, আসতে হ'ল কি না! না এসে যাবে কুন্ চুলোতে। এই মাঝমাঠে আর কে তুমাদের লেগে দানাপানি সাজায়ে রেখেছে!' তারপর ছোটখাটো দলটা দোকানের চত্বরে পৌঁছে যেতেই খুব বিনীত ভঙ্গিতে অভ্যর্থনা করল গোপাল, 'আসুন, বাবুমশয়রা! বসুন—'

কিন্তু বাবুমশাই বসল না। মোটা চশমার ফাঁকে ধারালো দৃষ্টি ফেলে গোপালের আপাদমস্তক জরিপ করতে শুরু করল। যেন গোপাল একটা পোষা কুকুর-ছানা, একটু ফাঁক পেয়ে বাইরে চলে গিয়েছিল, আবার ঘরে ফিরতেই মনিব ওর পা মুখ জিভ খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছে। বাবুটির দৃষ্টিতে এমনি একধরণের সন্দেহ, বিরক্তি, অবহেলা! অন্তত গোপালের সেইরকম মনে হওয়ায় মুখের হাসিটুকু মিলিয়ে গেল। বাবু-মশয়ের উপর থেকে চোখ সরিয়ে নিল সে। মহিলাটির দিকে তাকাল। আর তৎক্ষণাৎ, এই ধবধবে-সাদা বিশাল-প্রস্থ্য-শরীরের সর্বত্র তাল তাল মাংসের বিপুল সমারোহ দেখে, পুনর্বার একধরণের ঈর্ষা ও বেদনা-বোধে আক্রান্ত হ'ল। তার মনটা সামান্য উত্তেজিত অস্থির, ছটফটে হয়ে-ওঠার উপক্রম করতেই গড়ানো পাথরের মত কোথাও ঠোক্কর খেয়ে স্থির হতে হতে বিষন্ন, আনমনা হয়ে গেল। কেননা এইসময় হাড়-পাঁজর-ঠেলে-ওঠা প্রায়-সমতল একটা বুক, সরু কাঠি-কাঠি কিছু হাত পা এবং রক্তহীন পাণ্ডুর একটা মুখের কথা তার মনে পড়ে গেল। সে কিনা গোপালের মায়ের পেটের আপনা বোন, বয়স ত্রিশ ছুঁই ছুঁই অথচ শরীরে মাংসের অত্যল্পতার জন্য যার বিয়ে বারবারই ভেঙে যাচ্ছে বলে লোকনিন্দার ভয়ে গোপালের আবার বিয়ে করা হয়ে উঠছে না। অথচ বিয়ে না করলে তার শরীরে ও মনে বিষম কষ্ট হচ্ছে, কেননা তার প্রথম পক্ষের বউটা তিন বছর হ'ল মরার পর থেকে সে বলতে গেলে সবদিকে উপোসিই থাকছে!

খুব শুকনো গলায় গোপাল আবার বলল, 'কই বাবু, বসুন—'

বাবুটি তবু বসল না। মোটা খসখসে গলায় জিজ্ঞেস করল, 'এখান থেকে সিউড়ি কদ্দূর হে?'

'আজ্ঞে ক্রোশ আটেক!' দূরত্বটা ইচ্ছে করেই সামান্য বাড়িয়ে

বলল গোপাল। তারপর চোখ ছোট করে বাবুটির বিশাল-থাবার মোটা-আঙুলে চকচকে হীরার আংটি দেখল, মেয়েমানুষটার কানে লাল-পাথর বসানো ঝলমলে দুল দেখল। অবশেষে ছেলেমেয়েদুটোর দিকে তাকিয়ে ওদের গায়েও কেমন সুন্দর থাকে থাকে মাংস জমে উঠছে দেখে ঈর্ষায় মুখ কালো করল। পুরো এক হপ্তা দাড়ি কাটে নি বলে আর পরণের কাপড়-গেঞ্জিটাও তেলচিট নোংরা বলে গোপালের দুঃখ হ'ল। আসলে তার এই চেহারা আর দোকানের এইরকম অবস্থা দেখেই বাবুরা হয়ত বসার কি কিছু খাওয়ার উৎসাহ পাচ্ছে না। নইলে এখন বিকেল-বেলায় বাবুদের ত চা-খাওয়ার টাইম। তবু ওরা এত দেরি করে এল কেন, চা কি খাবারের কথা বলছেই বা কই, ভাবসাব ঠিক বোঝা যাচ্ছে না ত! চতুর বেড়ালের মত গোপাল চোখের দৃষ্টি প্রখর করল।

'এদিকে বাস যাবে কখন?' বসার পরিবর্তে জুতো থেকে খুলে বেঞ্চির ওপর একটা পা রাখল লোকটা। গোপাল রীতিমত আহত হয়ে দেখল হাতের থাবার মতই প্রকাণ্ড লোমশ পা। বেঞ্চিটাও মড়মড়িয়ে উঠল। গোপাল বিরক্ত ভঙ্গিতে রাগ-রাগ গলায় বলল, 'ফের বাস কুথাকে পাবেন বাবু! টুকচি আগেই ত শেষ বাসটো চলে গেল—'

'চলে গেল?'

'হাঁ বাবু। আবার হুই কাল ভোরে—'

'তাহলে!'

গোপাল দেখল, লোকটার মুখ দুশ্চিন্তায় কালো হয়ে উঠল। জোড়া-ভুরুর একঝাঁক লোম বিরক্তিতে কুঞ্চিত হয়ে কাঁপতে শুরু করল। চশমাটা খুলে সে তাকাল মেয়েমানুষটার দিকে। গোপালও তাকাল। মেয়েমানুষটার ভরাট গালের মাংস লম্বা হয়ে যেন ঝুলে পড়েছে! সেই কোন সকালে ঠোঁটে মুখে রং বুলিয়েছিল। এখন রোদেঘামে গলে গিয়েছে। ছেলেমেয়েদুটোর মুখ পর্যন্ত কালো, থমথমে। ওরা নিঃশব্দে মায়ের শরীর ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের নধর কচিকচি ফোলাফোলা মুখের দিকে চেয়ে গোপালের কেমন মায়া হ'ল। আহা, ওদের গাড়িটা ভাল হয়ে যাক। আঁধার নেমে আসার আগেই ওরা ফিরে যাক সিউড়ি। এইসময়, গোপাল গাড়িটার দিকেও একবার তাকাল। ড্রাইভার এখনও নীচে শুয়ে। যন্ত্রপাতির ঠুকঠুক আওয়াজ উঠছে। গলায় খুব দরদ দিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, 'গাড়ীটো এখানে সারাই হবে না বাবু?'

'কে জানে!' প্রায় ধমকের মতই চেঁচিয়ে উঠল লোকটা। তারপর হতাশ

ভঙ্গিতে বেঞ্চির এক কোণায় বসে পড়ল। সেই বলিষ্ঠ দেহের ভারে পুরনো জামরুল কাঠের বেঞ্চিটা গুঙিয়ে উঠল। গোপাল ভয়ে ভয়ে পায়া দেখল। এর ওপর ওই ধুমসী মেয়েমানুষটা যদি গতর নামায় তাহলে পায়াগুলোর কি অবস্থা হবে ভেবে গোপাল একধরণের আশঙ্কা ও অস্থিরতায় পীড়িত হ'ল। সে আর কাওকে বসতে বলার বিন্দুমাত্র উৎসাহ বোধ করল না।

বেঞ্চিতে বসে খুব অসন্তুষ্ট ভঙ্গিতে বাবুটি বলল, 'আমি সকালেই তোমাকে বলেছিলাম গাড়ির কণ্ডিশন খারাপ, চল ফিরি! কোলকাতায় আমার জরুরী কাজ—'

'তাতে কি! কোলকাতার পথেও গাড়ি খারাপ হতে পারত!'

এই প্রথম মেয়েমানুষটার গলা শুনল গোপাল। তার মনে হ'ল, 'ই-মাগীটোও খুব তেজী বটে!' কেননা বাবুর সঙ্গে কেমন সমানে-সমানে গলা উঁচিয়ে কথা বলছে দেখ! যেন এখুনি একটা ঝগড়া লেগে যাবে। গোপাল ভয়ে ভয়ে বাবুটির মুখ দেখল।

'তবু জি-টি রোডে পড়লে ভাবনা ছিল না। হরদম বাস যায়। আমরা অন্তত সময়মত পৌছুতে পারতাম—'

'ঠিক আছে! ওসব ভেবে এখন লাভ নেই। বাবলু বীণার খিদে পেয়েছে। কি আছে দেখ—'

'কি আবার থাকবে এখানে!' লোকটার চওড়া কপালে ভাঁজ পড়ল। নাকের পাটা কুঞ্চিত হ'ল। চোখে চশমা ঠেসে ধারালো দৃষ্টিতে গোপালের আপাদমস্তক দেখল। দোকানের ভিতরটা খুঁটিয়ে লক্ষ্য করল। গোপাল এবার সামান্য উৎসাহিত হয়ে বলল, 'আজ্ঞে সব তাজা খাবার আছে বাবু, পাউরুটি আছে, ডিম আছে, বললে হাত-চালিয়ে এখুনি গরম আলুর চপ ভেজে দেব—'

'চপ থাক্!' বুনো শুয়োরের মত ঘড়ঘড়ে গলায় গোপালকে ফের ধমকাল লোকটা। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'ডিম খাও তোমরা—'

'তাই করুক। দুটো করে হাফ বয়েল—'

'ওহে, আটটা ডিম কর তুমি।' লোকটা এবার নড়েচড়ে বেঞ্চির ওপর অনেকখানি জায়গা নিয়ে গুছিয়ে বসল। ছেলেমেয়েদুটোও বসল। গোপাল আবার বেঞ্চির পায়া দেখল। আর জায়গা না থাকায় ওই পাহাড়-প্রমাণ মেয়েমানুষটা বসতে পারবে না ভেবে নিশ্চিন্ত হ'ল। লোকটা আবার বলল, 'ওসব প্লেট চামচা লাগবে না। তুমি শালপাতায় দাও।'

'আচ্ছা বাবু!'

মোটামুটি খুশি হয়ে চতুর চটপটে ভঙ্গিতে দোকানে ঢুকল গোপাল। ঘাড় নীচু করতে ভুলে যাওয়ায় খড়ের চালায় ঠোক্কর লেগে চুলগুলো এলোমেলো হ'ল। তক্তাপোষে একটু জোরে পা রাখার দরুণ কট্‌কট্‌ আওয়াজ উঠল। গোপাল অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে দেখল, চৌকো আর গোলাকৃতি ছেলেমেয়েদুটো মিট মিট করে হাসছে। কৌতুকে ওদের চোখ টসটস করছে। গোপাল চুলগুলো পিছনের দিকে ঠেলে দিতে দিতে ভাবল, এই তক্তাপোষ, বাইরের বেঞ্চিটা এবার সে পাল্টাবে। আমকাঠ দিয়ে গোটা দুই চেয়ার বানাবে সে। একটা কাঁচ-বসানো ছোট আলমারি করবে। দোকানটাকে একটু ভদ্ররকম করে না সাজালে বাবুরা বড় অবজ্ঞা করে। বিক্রিবাট্টাও কম হয়। ছেলেমেয়েদুটো এখনও কেমন হাসছে দেখ! যেন ধম্মঠাকুরের সং সেজেছে গোপাল! শালা, যেমুন মা তার তেমুন ছা! যেন দুটো মাংসের চালকুমড়া—

মুখ-চোখ ভারিক্কিগোছের করে টিনের মগে জল ঢেলে ডিম সেদ্ধ হতে দিল গোপাল। মনে মনে হিসেবও করে ফেলল। এমনিতে চার আনা করে বিক্রি, কিন্তু বাবুদের কাছ থেকে চল্লিশ পয়সা হিসেবে দাম নেবে গোপাল। 'ছ'আনা করে লিতম, কিন্তু বাবুমশয়, তুমার মেজাজটো যেমুন চড়া, আমার ডিমের দামও তেমুন! দু'গণ্ডার দাম পড়ল গিয়ে তুমার—'

শালপাতা গুছিয়ে ঠিক করতে করতে গোপাল চেঁচিয়ে বলল, 'চা করব না বাবু?'

'চা?' লোকটি আবার বিরস বিরক্ত মুখে খুঁটিয়ে দোকান দেখল, 'মাটির ভাঁড় আছে?'

'আছে বাবু!'

'গরম জলে ধুয়ে দু'ভাঁড় দিও!'

'আচ্ছা!'

একটা ভাঙা পাখা দিয়ে উনুনে সামান্য বাতাস করতেই আঁচটা গনগনিয়ে উঠল। ডিমগুলো হয়ে এসেছে। মগটা নামিয়ে কেট্‌লি চাপাল। একটা ডিম তুলে তক্তাপোষে ঠুকে খোলা ছাড়াতে ছাড়াতে বাবু-বিবিরা এখন কি করছে, দেখতে চাইল। তারপর গলায় এক ধরণের ঘনিষ্ঠ আমেজ এনে একটু খোঁজ-খবর নেবার চেষ্টা করল, 'বাবুমশয়দের কলকাতা থাকা হয় নিশ্চয়?'

কিন্তু ও-পক্ষ থেকে কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। গোপাল দেখল, বাবুটি

একদৃষ্টে গাড়ির দিকে তাকিয়ে। মেয়েলোকটা শালবন দেখছে। ছেলে-মেয়েদুটো বেঞ্চিতে বসে পা দোলাচ্ছে। একটা ট্রাক ছুটে আসছে দুমকার দিকে। গোঁ গোঁ শব্দ। গোপাল শব্দ করে আরো একটা ডিমের খোলা ভাঙল। তারপর ট্রাকটা পার হয়ে গেলে, গলা চড়িয়ে ফের বলল, 'ই-দিককার সব দেখলেন বাবু? তারাপীঠ, বক্রেশ্বর, ললাটেশ্বরী……?'

কিন্তু অপরপক্ষ এবারও চুপচাপ। যেন গোপালের কথা শুনতেই পাচ্ছে না কেউ! রীতিমত অপমান বোধ করল সে। এমন অবজ্ঞা তাকে কেউ করে না। মাঠের চাষ দেখতে সহর থেকে বাবুরা আসে। তারা নিয়মিত গোপালের খোঁজ-খবর করে। একেবারে নিরেট মুখ্যু না ত গোপাল। গাঁয়ের স্কুলে ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েছিল। কম-বয়সে বাপটা মরে না গেলে একটা পাশ দিয়ে খড়িমাটির কারখানায় বাবুদের মত কাজ করতে পারত। বাবুদের সঙ্গে কি রকম 'ব্যাভার' করতে হয় সে জানে। বাবুদের সে 'মান্যি' করে। বাবুরাও তাকে ছিটেফোঁটা ভালবাসে। মামুদবাজার থেকে 'লয়া চকচকে' মোটর-সাইকেল চেপে আসেন বিষ্টুবাবু। গোপালের দোকানে বটতলায় গাড়ি রেখে তিনি ত ফি-বারই বলেন, 'একটু নজর রাখিস রে গোপাল, আমি জমিটা দেখে আসি।' গোপাল তাড়াতাড়ি জল দেয়, চা দেয়। বিষ্টুবাবু হাসিহাসি মুখে বলেন, 'তোর পুণ্যির শেষ নেই রে গোপাল! এই ধাপার মাঠে দোকান দিয়ে বসে আছিস, তাই চা-টা জলটা খেতে পাই। নইলে তেষ্টায় ছাতি ফেটে যেত যে রে।' 'আর ই-শালাদের ব্যাভার দেখ!' শালপাতায় কাঠি গুঁজে তে-কোণা ঠোঙা বানাতে বানাতে রাগে গজ গজ করল গোপাল, 'মানুষ বলে গেরাজ্যি-ই নাই, যেন জন্তুজানোয়ারের পারা কেউ বসে রইছি আর থেকে থেকে চিঁ চিঁ করে চিল্লাচ্ছি।…শালো, তুমাদের সব পয়সার গরম বটে…কাঁচাপয়সার গরম। মুখের টুকচি রা কাড়তে কলজেয় চোট লাগে, গতরের মাসে টান ধরে।…এখুন সারারাত থাক ইখানে। আমি ত সাঁঝ লাগলেই দোকানে কুলুপ লটকে সরে পড়ব হে…'

এইসময় গোপাল দেখল, বাবুটি আচমকা উঠে দাঁড়াল। তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে গেল গাড়ির কাছে। কি ব্যাপার, গাড়িটা সত্যি সত্যি, ঠিক হয়ে গেল নাকি! গোপাল মুখ কালো করে তাকিয়ে রইল। এদের ভোগান্তিটা এত অল্পেই শেষ হয়ে যাক এখন সে আর তা চাইছিল না। বরং তার ইচ্ছা, সারারাত গাড়িটা পড়ে থাকুক রাস্তায়, বাবুরা ঠ্যাং ছড়িয়ে শুয়ে থাকুক মাঝমাঠে, গা-গতরের তেল খানিক ঝরুক, গরম খানিক নামুক…

গোপাল মনে মনে খুব আবেগ দিয়ে মা কালীকে ডাকল। তারপরই খুশি হয়ে দেখল, সারবার কোনো লক্ষণই নেই। ড্রাইভারের সঙ্গে দু'চারটে কি কথা-বার্তা হ'ল, বাবুটি ফের লম্বাটে মুখখানা ভয়ঙ্কর কালো থমথমে করে বেঞ্চিতে এসে বসে পড়ল। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে নাকে-দড়ি-বাঁধা ভালুকের মুখের কথা মনে পড়ছিল গোপালের। খুব হাসি পাচ্ছিল। এমনসময় মেয়ে মানুষটাকে কথা বলতে শুনল—

'কি হ'ল? কি বলছে রামলাল?'

খুব সরু মিন মিনে গলায় জিজ্ঞেস করল মহিলাটি। আর সঙ্গে সঙ্গে বারুদে আগুন লাগার মতই দপ করে জ্বলে উঠল বাবুটি, 'কি আবার বলবে! সারা-রাত থাক এখন এই জঙ্গলে—'

'আঃ, তুমি এত অস্থির হচ্ছ কেন!'

'তুমি চুপ কর! তোমার জন্যই এই দুর্ভোগ—'

গোপাল খুব খুশি হয়ে মনে মনে নখ বাজাল। নারদ মুনির নাম করল। তাকিয়ে দেখল ধুমসী মেয়েমানুষটার গালের মাংস ধমক খেয়ে অপমানে ঝুলে পড়েছে। ঠোঁট কাঁপছে। মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিয়েছে। গোপাল ঠোঙায় নুন ছড়াতে ছড়াতে কানদুটো সজাগ রাখল। একটু পরেই বাবুটি আবার ছটফটে গলায় বলে উঠল, 'কাল বিকেলের মধ্যে কোলকাতায় না পৌঁছুতে পারলে আমার কত ক্ষতি হবে জান?'

'আমার জেনে কি লাভ।'

'পরশু গ্লাসফ্যাক্টরির সেই কেস্‌টা উঠবে হাইকোর্টে। কাল সন্ধ্যায় ব্যারিস্টার ব্যানার্জি আসবে কাগজপত্র নিয়ে—'

'ম্যানেজাররা ত আছে!'

'ড্যাম্ ইওর ম্যানেজার! সব ক'টা বেহেড্ মাতাল। স্ট্রাইক ভাঙতে গুণ্ডা লাগায়, কিন্তু কিছু একটা হয়ে গেলে লাশ সরাতে পারে না। এই নিয়ে সেকেণ্ড টাইম......'

'আঃ, চুপ কর!'

'ও, ইয়েস, ইয়েস!'

গোপালের দিকে চোখ রেখে হঠাৎ চুপ করে গেল লোকটা। তীব্র দৃষ্টিতে গোপালের মুখের রেখা পড়তে চাইল। সেই জ্বলন্ত দৃষ্টির সামনে যেন ভয় পেয়ে চোখ নামিয়ে নিল গোপাল। ওর দম বন্ধ হয়ে এল। উত্তেজনায় হাত সামান্য কাঁপতে লাগল। সব কথা সে ঠিক ঠিক বুঝতে পারল

না। বোঝার কথাও না। গাঁ ঘরের মুখ্যু দোকানদার। জীবনে কখনো সিউড়ি ভিন্ন শহর দেখে নি। বিড়ির পাতা আনতে বাসে করে দুমকা গিয়েছে দু'-চারবার। কিন্তু কোনোদিন রেলগাড়ি চাপে নি। কলকারখানার রকমারি ঝুট ঝামেলার খবর তার জানা নেই। মামুদবাজারের খড়িমাটির কারখানার পত্তন মোটে সেদিন। ওখানে কোনোদিন ধর্মঘট হতেও দেখে নি। তবু একটা কিছু বোঝার চেষ্টা করল গোপাল। একটিমাত্র 'লাশ'-শব্দের উপর নির্ভর করেই অস্পষ্ট আচ্ছন্নভাবে কিছু একটা আঁচ করতে চাইল। তার বত্রিশের রক্ত সামান্য অস্থির চঞ্চল হ'ল। বুকটা ঢিব ঢিব করতে লাগল। কাঁপা হাতে ঠোঙায় ডিম সাজাতে সাজাতে সে আবার বাবুটির মুখের দিকে তাকাল।

আর তৎক্ষণাৎ, অন্ধকারে বিদ্যুৎ চমকালে শ্মশানে শৃগালের মাংসাহারী মুখ যেমন ভয়ানক, তেমনি এই বাবুটির মুখের আদলে সে নিমচণ্ডী গাঁয়ের মদন চৌধুরীর মুখ দেখল। দেখে প্রবলভাবে চমকে উঠল। কেননা অল্প কিছু স্মৃতি, কথা ও ঘটনার কথা তার মনে পড়ে গেল। তামাম জমিদারী বেনাম করে চৌধুরীমশাই এখন ডাকসাইটে জোতদার। এই লোকটির মতই ফর্সা রঙ, দীঘল শরীর, ছুঁচলো মুখ, সারা গায়ে ঘন কাঁচা পাকা লোম, মোটা মোটা আঙুল, মস্ত বড় হাতের থাবা। বুড়ো হয়েছেন বলে বড়-দালানের বাইরে আর বের হ'ন না। কিন্তু গোপাল জানে, গেল সনের আগের কার্তিকে তাঁর হুকুমেই গাঁয়ের নিমাই মণ্ডল খুন হয়েছিল। তার লাশ পাওয়া গিয়েছিল উত্তরের আমবাগানে, ফণীমনসার ঝোপে। গোপাল আরও জানে, তাদের দু'চার বিঘা জমিজিরেৎ যা ছিল এই চৌধুরীমশাই-ই তা হালগরু সমেত জোর করে লিখিয়ে নিয়েছিল বাপের কাছ থেকে। সেই জমির শোকেই বাপটা—

প্রথমে ভয় পেয়েছিল, কিন্তু নিমাই মণ্ডলের কথা, তার বাপের কথা মনে পড়া মাত্র গোপালের চোখ জ্বালা করে উঠল। মাথার খুলিতে এক ধরণের যন্ত্রণা। দাঁতে দাঁত চেপে চোয়ালদুটো শক্ত করল। বাবুটি ডিমের জন্য তাড়া দিয়েছে। শালপাতার ঠোঙায় ডিম নিয়ে সে বাইরে এল। কিন্তু লোক-গুলোর মুখে খাবার তুলে দিতে ওর আর ইচ্ছে করছিল না। সাপ দেখলেই লোকে যেমন সন্দেহকুটিল চোখে তাকায় গোপালও তেমনি শক্ত মুখে আবার লোকটির সারা শরীর দেখল. 'কেমুন শ্যালের পারা সরু মুখটো, দেখলেই মন বুলে ইয়ার ভিতর পাপ আছে।'…এক একটা ডিমের দাম সে আট আনা

করে নেবে বলে ঠিক করে ফেলল। যদি দিতে না চায়, যদি ঝামেলা করে, মাঠ থেকে তাহলে ইকবাল বুধনদের ডেকে আনবে। গাড়িটা নামিয়ে দেবে কাদায়—

'ওহে, এখানে লোকজন পাওয়া যাবে?' একটা গোটা ডিম মুখে চালান করে বাবুটি বলল, 'গাড়িটা ঠেলে নিয়ে যাবে সিউড়ি।'

'না বাবু!' খুব স্পষ্ট করে ঘাড় নাড়ল গোপাল, 'এখুন চাষের সময়, কেউ যেতে লারবে!'

'বেশী পয়সা দেব—'

'তবু লারবে!'

'হুঁ!' আবার প্রকাণ্ড হাঁ করে দ্বিতীয় ডিমটা মুখে তুলে নিল লোকটা। দাঁত দিয়ে ঠোঁটের নীচের অংশ অল্প কামড়ে অবাধ্য একটা ঘোড়ার মত দাঁড়িয়ে থাকল গোপাল। সূর্য পুরোপুরি ডুবে গেছে। সন্ধ্যা ঘনাতে আর দেরী নেই। শালবনে অন্ধকার নেমে আসছে। মাঠ থেকে লাঙ্গল গরু নিয়ে গাঁয়ের পথ ধরেছে অনেকে। দোকানের লণ্ঠনটা জ্বালবে কিনা চিন্তা করল গোপাল। রুমালে মুখ মুছতে মুছতে বাবুটি এইসময় বলল, 'একটা গরুর গাড়িও পাওয়া যাবে না?'

'না আজ্ঞে!' একইরকম শক্তমুখ কঠিনগলায় জবাব দিল গোপাল, 'এখুন গরুগুলান মাঠে খাটছে। কেউ গাড়িতে জুতবে না।'

তারপর চা করবে বলে দোকানে উঠে এল। ওর রক্তের ভিতর চিন চিনে জ্বালা। মনটা পুড়ছে। হাত পা উত্তেজনায় ঘামছে। ওই 'লাশ' শব্দটা ছোট্ট একটা কাঠঠোকরার মত হৃদপিণ্ডের দরজায় বসে কেবলই ঠুকঠুক করছে আর গোপালের কেমন যেন শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। আর থেকে থেকে নিমাই মণ্ডলের মুখটা মনে পড়ছে। চৌধুরীমশায়ের লোক লাঠি দিয়ে নিমাইয়ের মাথার খুলি ফাটিয়ে দিয়েছিল। চাপ চাপ রক্ত কালো হয়ে জমেছিল কপালে, মুখে বুকে। নিজের জমিপুকুর নিয়ে চৌধুরীমশায়ের সঙ্গে মামলা লড়তে গিয়েছিল নিমাই। গোপালের বাবাও নাকি বলেছিল, মামলা করব। সেই মামলার পয়সা যোগাড় করতে করতে শুকিয়ে দড়ি দড়ি। একদিন ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে পথে পড়ে জ্ঞান হারাল। গোপাল তখন নিমচণ্ডী গাঁয়ের স্কুলে। বড় কাঁদরের ধারে বাপকে পোড়ান হ'ল। গোপাল মুখে আগুন দিল।···স্মৃতি খুব উজ্জ্বল না। বাপের মুখটা তেমন স্পষ্ট মনে পড়ে না। কিন্তু নিমাই মণ্ডল মরল সেদিন। সিউড়ি থেকে বড় দারোগা এল। ডোমেদের দিয়ে কাপড়-

জড়িয়ে বাঁশে ঝুলিয়ে লাশ নিয়ে গেল। লোটন বাগদী আর নিয়ামৎ চাচা নিমাইয়ের পক্ষে সাক্ষী দেবে বলেছিল। দু'জনের খুনের দায়ে জেল হয়ে গেল!

'...ই বাবুটোও লাশের কথা বুলল! কেনে বুলল। কিসের লাশ বটে। কুথাকে সরাতে হয়!...ই বাবুটো ভাল লয়। নিশ্চয় লয়। মদন চৌধুরীর পারা ই-শালোও একটো খুনী বটে। আমি ইয়ার গাড়ি ঠেইলতে লোক দিব না। গরুর গাড়ি ঠিক করে দিব না। আগার মন হলেই আমি ইসব দিতে পারি। কিন্তু দিব না।'

চা করে বাইরে নিয়ে এল গোপাল। প্রকাণ্ড থাবায় ভাঁড়টা ধরিয়ে দিয়ে একমুহূর্ত চুপ থাকল। জরো রুগীর মত গরম ভাঁপ উঠছে ভেতর থেকে। জিভটা তেতো লাগছে। আর রক্তে চিনচিনে জ্বালা। খুব জোরে চিৎকার করতে ইচ্ছে করছে, তীর-বেঁধা বুনো শুয়োরের মত ভয়ঙ্কর একটা চিৎকার। কিন্তু সাহস হচ্ছে না। বাবুমশয় একদৃষ্টে তার দিকে চেয়েই আছে।

একসময় শুকনো খরখরে গলায় হঠাৎ বলে উঠল গোপাল, 'ইখানে বাঘ আছে বাবু, রেতে টুকচি নজড় রাখবেন!'

—'বাঘ!'

চায়ে চুমুক দিতে গিয়ে ঠোঁটে ছ্যাঁকা গেল বাবুটি। ধুমসী মেয়েমানুষটার হাত কেঁপে অর্ধেক চা ছলকে পড়ল মাটিতে। ফর্সা মুখ ভয়ে নীল হয়ে গেল। চোখ বড় বড়। এতক্ষণে খুব সরু করে হাসল গোপাল, 'আমি কখুনো দেখি নাই। তবে ডাক শুনেছি আজ্ঞে। পাহাড় হ'তে নেমে হোই শালবনে ঢুকেছে—'

'এই শালবনে!' মেয়েমানুষটা প্রায় ডুকরে উঠল। গোপাল দেখল, বাবুমশয়ের জোড়া ভুরুর লোম খাড়া হয়ে উঠেছে। চোখের সাদাজমি মরামাছের পিঠের মত। দৃষ্টির সেই ধারালো তীব্রতা লোপ পেয়ে কেমন করুণ আর অসহায় দেখাচ্ছে। ছেলেমেয়েদুটোও ভয়ে জড়ো-সড়ো। ছোটটা ত মায়ের আঁচল-তলায়। কিন্তু গোপালের একটুও মায়া হ'ল না। মদন চৌধুরীর সঙ্গে এই বাবুটার মুখের ঠিক কতখানি মিল খুঁটিয়ে লক্ষ্য করতে করতে সে আবার বলল, 'সেদিন গাঁয়ে ঢুকেছিল বাবু, একটো বাছুর লিয়ে গেল—বকনা বাছুর আজ্ঞে—'

—'তুমি চুপ কর!'

ছেলেমেয়ে আর স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে যেন জোর করে সাহস কুড়িয়ে আনল বাবুটি। প্রচণ্ড চিৎকারে গোপালকে ধমকাল।

কিন্তু গোপাল আর রাগ করল না। বরং ওদের ছাইয়ের মত সাদা মুখ-ক'টা দেখতে দেখতে খুশি হয়ে উঠল। এই শালবনে বাঘ থাকুক বা না থাকুক, এখন সারারাত ওরা যে গাড়ির দরজা জানালা বন্ধ করে বসে বসে গরমে সেদ্ধ হবে আর সারারাত ঠকঠক করে কাঁপবে, ভাবতেই গোপালের মনটা অদ্ভুত এক আবেগে দুলে উঠল! রক্তের জ্বালাটাও যেন কমে আসছে আস্তে আস্তে। এইবার পাওনাগণ্ডা বুঝে পেলেই দোকানের ঝাঁপ ফেলে কুলুপ অর্থাৎ তালা লটকে গাঁয়ের পথে হাঁটা ধরবে সে।

দাসমশায়ের গৃহনির্মাণ

একটানা চল্লিশ বছর একটা কনট্রাক্টরী ফার্মে কাজ করেছেন দাসমশাই। রাস্তাঘাট মেরামত থেকে বড় বড় বিল্ডিং তৈরির কাজ। এন্ট্রান্স ফেল্ করে অভাবের টানে ঢুকে পড়েছিলেন। বেতন পেতেন আঠারো টাকা। কিন্তু তখন টাকার দাম ছিল। চার আনায় পেট পুরে মাংসভাত খাওয়া যেত। এক আধলার বিড়ি কিনলে একদিন চলে যেত।

ঠিকেদার শৈল চৌধুরী একটু একটু করে ফুলতে লাগলেন। বড় বড় কনট্রাক্ট হাতে আসতে লাগল। একা সামলাতে পারেন না। ফার্ম তৈরি হ'ল—চৌধুরী এণ্ড কোং, কনট্রাক্টরস্ এণ্ড বিল্ডার্স। দাসমশায়ের পদমর্যাদা বাড়ল, বেতনও। প্রায়-দক্ষ একজন ওভারশিয়রের মতো ঘুরে ঘুরে তিনি বিল্ডিং কন্‌স্ট্রাকসনের কাজ তদারকি করতে লাগলেন।

এখানে-ওখানে ভ্রাম্যমাণ অবস্থায় বিয়েও করলেন। ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে উঠল। দাসমশাই তিন মেয়েকে পাত্রস্থ করলেন। একমাত্র ছেলেকে শৈলবাবুর সুপারিশক্রমে বজবজের একটা কারখানায় ঢুকিয়ে দিলেন। তারপর এই মফঃস্বল শহরে এসে নতুন সরকারী-হাসপাতালের কাজ যেদিন শেষ হ'ল সেদিন ফার্মের কনিষ্ঠ মালিক শৈলবাবুর চতুর্থ পুত্র দাসমশাইকে ডেকে বলল, 'আপনি একেবারে বুড়ো হয়ে গেছেন! এবার বিশ্রাম নিন।'

দাসমশাই হাঁ করে বাতাস টানলেন. 'কেন ছোটবাবু? আমি তো এখনো খাটতে পারি।'

পারিজাত বলল, 'তা অবশ্য পারেন। তবে ব্যাপার কি জানেন, এসব কন্‌স্ট্রাকশনের কাজ আমরা আর করব না। ফরেন এক্সপোর্টে চলে যাচ্ছি এবার। দিল্লীতে হেড্ অফিস হয়েছে।'

তারপর হিসাবের খাতাপত্র দেখে বলল, 'তিন মেয়ের বিয়েতে সাতশ করে একুশ'শ টাকা নিয়েছেন। সে আর দিতে হবে না। এই নিন আরো দু'হাজার টাকার চেক। চল্লিশ বছর কাজ করেছেন আপনি। আপনার সার্ভিসের

তুলনা হয় না। এই চেকটা আপনার রিওয়ার্ড।'

নতুন হাসপাতাল থেকে ক্যাম্প গুটিয়ে কলকাতায় চলে গেল ফার্ম। ঢালাই-মশলা-মাখার ভারি যন্ত্রগুলো বহন করে শেষ-ট্রাকটাও চলে যাবার পর সেই স্বজনহীন নির্বান্ধব পুরীতে দু'হাজার টাকার একখানি চেক আর চল্লিশ বছরের 'তুলনাহীন সার্ভিসে'র স্মৃতিভার সম্বল করে বোবার মতো দাঁড়িয়ে রইলেন দাসমশাই। তাঁর কানের পর্দায় লোহা-কাটার বিকট ধাতব শব্দ থেমে থেমে একটানা বাজতে লাগল।

ক'দিন পরে টাকাটা নিয়ে বড় দুর্ভাবনায় পড়লেন দাসমশাই। কি করবেন, কি করা যায়? ছেলে এসেছিল কলকাতা থেকে। বলে গেছে, বুড়ো মা-বাপের খাই-খরচা সে পাঠাবে। তা হলে এই টাকাটা হাতে জমিয়ে রেখে লাভ নেই। অভাবের টানে খরচ হয়ে যাবে কোনদিন। এক টুকরো জমি কিনে যেমন-তেমন একখানা ঘর তোলার চেষ্টা করবেন? মন্দ হয় না। সারাজীবন কত লোকের কত বাড়িই তো বানালেন। ভিৎ থেকে শুরু করে ছাদে ঝাণ্ডা তোলার পাকা খুঁটি পর্যন্ত বসিয়ে দিলেন। এখন তাঁর নিজের জন্য একখানা ছোট বাড়ি। তাঁর ছেলের জন্য, নাতিনাতনীর জন্য। ওরা যেন বাউণ্ডুলে হয়ে ঘুরে না বেড়ায়, যেন কোথাও একটু পাকা আশ্রয় পায়। যেন চাকরি-জীবনের শেষে তাঁর মতো নিরাশ্রয় হয়ে ফাঁকা আকাশের তলে দাঁড়িয়ে দীর্ঘশ্বাস না ফেলে!...দাসমশাই মনস্থির করে ফেললেন।

নতুন হাসপাতালের দক্ষিণে একেবারে গাঁয়ের ধারে ছোট ছোট প্লটে জমি বিক্রি করছিলেন ইয়াকুব মিঞা। পতিত ডাঙা জমি। কেউ ভাবেনি কোনো-দিন বাড়ি উঠবে এখানে, বিঘা ছেড়ে কাঠা দরে বিক্রি হবে জমি। কিন্তু শহরে জমির দাম নাগালের বাইরে যাওয়ায় মধ্যবিত্ত মানুষেরা হালে এই ডাঙার দিকে ঝুঁকেছে। খোঁজ-খবর নিয়ে দাসমশাই একটা প্লট কিনে ফেললেন। দু'কাঠা তিনছটাক জমি, দাম পড়ল রেজিস্ট্রি খরচা সমেত চারশ নব্বুই টাকা। তারপর বসলেন কাগজ পেন্সিল নিয়ে। চল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতা তাঁর। ঘরবাড়ির খুঁটিনাটি কি না জানেন তিনি? মাপজোখ, নক্সা আঁকা—কি না বোঝেন? সাদাকাগজে দাগ টেনে ক'মিনিটেই দুকোঠাওলা একখানা বাড়ির প্ল্যান ছকে ফেললেন দাসমশাই। ক'ফুট ভিৎ, ক'ফুট দেয়াল, ক'ইঞ্চি গাঁথুনি, মশলার কত ভাগ, ক'টা দরজা জানালা—সব হিসেব করে ফেললেন। আলাদা আলাদা করে ইটের দাম, বালির দাম, সিমেন্টের দাম কষলেন। তার সঙ্গে মিস্ত্রিমজুরের খরচা যোগ করে দেখলেন, দেড়হাজার টাকায় কিছুই হয় না। অনেক ঘাটতি।

দাসমশাই মন খারাপ করে ভাবলেন, ছেলে কিছু দিতে পারবে কি? অন্তত পাঁচ-সাত'শ? তাহলে একটু কাটছাঁট করে বাড়িটা শুরু করতে পারেন তিনি। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সব দেখাশুনা করবেন। একখানা ইটও নষ্ট হবে না। একটুও সিমেণ্ট-বালির অপব্যয় হবে না। মিস্ত্রিমজুরের বাবারও ক্ষমতা নেই একচুল সময় চুরি করার। চল্লিশ বছরের অভিজ্ঞ চোখকে ফাঁকি দেওয়া কি সোজা কথা! সব বুঝিয়ে চিঠি লিখলেন দাসমশাই। ছেলে জবাব দিল, 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে বাবা, যে দুম্ করে জমি কিনে বসলে?'

দাসমশাই স্ত্রীর শরীরের দিকে তাকালেন। কানে একজোড়া ফুল ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট নেই। যা ছিল মেয়েদের বিয়েতে হাতবদল হয়েছে। দাসমশাই আবার কাগজ পেন্সিল নিয়ে বসলেন। এবার ঘর একখানা। ভিৎটা সিমেণ্টে তুলে বাকি অংশ মাটি দিয়ে গাঁথবেন। তার উপর কড়া প্লাস্টার করে দেবেন, ক্ষতি হবে না। কুয়ো পায়খানার এখন দরকার নেই। সামনেই তো পুকুর আর ধানমাঠ। একটা জানালাও কমিয়ে দিলেন, ছাদের লোহা ছয় থেকে নয় ইঞ্চিতে সরিয়ে নিলেন। তাহলে খরচটা কততে দাঁড়াল?

আবার ইটবালিমিস্ত্রিমজুরের হিসেব করলেন দাসমশাই। দেখলেন, একখানা ঘর যদি বা ওঠে তার দরজাজানালা কিছুতেই হয় না। একটা জানালা আর একটা দরজার জন্য কত খরচ পড়বে? এখন কাঠের দর কত? দাসমশাই স্টেশনের কাছে পাঞ্জাবিদের কাঠগোলায় গিয়ে খবর নিলেন। কাছারির বটতলায় আম-কাঁঠালের পাটা আসে—তারও দরদাম করলেন। তারপর ছেলেকে লিখলেন, অন্তত দেড়শ টাকা...। ছেলে এবার রাগ করে জানাল, 'আমাদের কারখানায় ছাঁটাই চলছে। ওভারটাইম বন্ধ। ধর্মঘট করার জন্য গতমাসের সাতদিনের মজুরি পাইনি। এ-মাসে তোমাদের দশটাকা কম পাঠাব।' দাসমশাই মরীয়া হয়ে তিন মেয়েকে লিখলেন। দু'জন উত্তর দিল না। বড় মেয়ে জানাল, জামাইয়ের সাম্প্রতিক অসুখে তার একগাছা চুড়ি বিক্রি করতে হয়েছে।

দাসমশাই বাড়ির নক্সা ও হিসাবপত্র টিনের বাক্সে তুলে রাখলেন। কিন্তু হাল ছাড়লেন না। কেউ কিছু দিক না দিক তাঁর নিজের টাকাটাই তো সুদে বাড়বে। বছরে ষাট টাকা সুদ, সুদের সুদ! আড়াই বছরেই দরজাজানালার টাকা উঠে আসবে!

গ্রাম থেকে রোজ একবার করে নিজের দু'কাঠা তিন ছটাক জমি

দেখতে যান দাসমশাই। টায়ারের চটি পায়ে ঘাসের উপর পায়চারি করেন। ডাঙার অন্য প্লটগুলো কারা কিনল, খোঁজখবর নেন। তাঁর নিজের জমিটা চতুষ্কোণ নয়, বাঁকাচোরা এবং জমির ঠিক মাঝখানে একটা বাজপড়া খেজুর-গাছ দাঁড়িয়ে আছে দেখে মন খারাপ করেন। তারপর লোক লাগিয়ে গাছটা কাটতে কত খরচ পড়বে ভাবতে ভাবতে বাসায় ফেরেন।

কোনোদিন ডাঙায় নতুন লোক দেখলে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে যান দাসমশাই। চোখ বড় করে আপাদমস্তক খুঁটিয়ে দেখতে থাকেন। যেন প্রতি-বেশী হিসেবে লোকটা ভালো হবে কি মন্দ হবে তার আঁচ পেতে চান। তার-পর তোবড়ানো গালে হাসির ভাঁজ ফেলে বলেন, 'কোন্ প্লটটা নেওয়া হ'ল? ওই উত্তরের ঢিবিটা? কত পড়ল?'

দাম শুনে দাসমশায়ের হাসিটা আরো উজ্জ্বল হয়, 'রোজই বাড়ছে, রোজই বাড়ছে! এই বেম্মডাঙা জমি. দিনদুপুরে শেয়াল ঘোরে, গরু ছাগল ছাড়া মানুষ হাঁটে না, এখন কিনা তিনশ টাকা কাঠা! ...'তা শীগ্‌গির বাড়ি তুলবেন তো, না ফেলে রাখবেন? আমি? তুলব মশাই, আমিও তুলব। ওই যে বাজপড়া খেজুর গাছটা দেখছেন, ওইটেই আমার জমি—'

গ্রামে ফেরার পথে মনে মনে হিসেব করেন, কাঠা প্রতি ষাট টাকা বেড়েছে। তাহলে তাঁর দু'কাঠা তিন ছটাক জমির দাম এখন কত দাঁড়াল? এই হারে বাড়লে পাঁচ বছর পরে কত দাঁড়াবে? বিশ-পঁচিশ বছর পরে? বাপ ঠাকুর্দারা ঠিকই বলতেন, মাটি শুধু দামী নয়—সোনার চেয়েও দামী। তা তুমি ধানজমি কেনো আর বাস্তুজমিই কেনো। সোনার ক্ষয় আছে, হারানোর ভয় চুরির ভয় আছে। কিন্তু দলিলপত্র ঠিক থাকলে জমির ক্ষয়ও নেই, চুরিও নেই। কিনে ফেলে রাখো, বছর বছর দাম বেড়েই যাবে। ...হাতে টাকা থাকলে আরো দু'একটা প্লট কিনতেন দাশমশাই।

একদিন জমি থেকে মুখ কালো করে ফিরলেন। স্ত্রীকে ডেকে বললেন, 'শুনছ নাড়ুর মা, আমার পুবের প্লটটা এক দারোগা কিনেছে।'

জমি সম্পর্কে হরিবালার কোনো আগ্রহ ছিল না। যেন সে বুঝে গিয়েছিল, ঝোঁকের মাথায় ওই কেনাই সার। এরপর কোন্‌দিন বাঁধা পড়বে, নয় তো বিক্রি। কুলোয় গম ঝাড়তে ঝাড়তে সে শুধু তাকাল। দাসমশাই বললেন, 'পুলিশের লোক কি ভালো হয় কোনোদিন? যত ঘুষ-ঘাষ চোর-ছ্যাঁচর নিয়ে কারবার। এমন প্রতিবেশীর সঙ্গে ঘর করে সুখ নেই!'

এবার হরিবালা বলল, 'তুমি কাল পরশুই বাড়ি তুলছ না-কি?'

দাসমশাই বিরক্ত হয়ে বললেন, 'একদিন তো উঠবে! আমিই তুলব, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে!'

হরিবালা বলল, 'যখন তুলবে প্রতিবেশীর কথা তখন ভাবলেই চলবে। এখন কেন মাথা গরম কর!'

'হুঁ, তুমি আর কি বুঝবে!'

দাসমশাই মনে মনে রেগে থাকলেন। তাঁর জমি কেনা ও বাড়ি করার ব্যাপারটা নাড়ুর মতো নাড়ুর মা'ও সুনজরে দেখে না। দু'জনেই সমান মূর্খ!

রাতে ঝির ঝির করে একটু বৃষ্টি হ'ল। মাটিটা নরম হয়েছে ভেবে সকালে ছোট কোদালখানা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন দাসমশাই। ডাঙায় এসে তাঁর এবং দারোগার জমির সীমানা-অংশ ভালো করে খুঁড়ে দিলেন। লম্বালম্বি গর্ত কাটা হয়ে গেলে ঘাসের উপর পা ছড়িয়ে বসে জিভ বের করে হাঁপাতে লাগলেন। তাঁর হাত পা অবশ হয়ে কাঁপতে লাগল। সেইসময় লক্ষ্য করলেন, একটা ট্রাক নতুন হাসপাতালের রাস্তা পার হয়ে ডাঙার দিকে এগিয়ে আসছে। কিসের ট্রাক, কেন আসছে, ভালো করে বোঝার জন্য দাসমশাই চোখের উপর হাত তুলে রোদ আড়াল করলেন। তারপর কোদালটা বগলে চেপে উঠে দাঁড়ালেন।

ট্রাকটা এসে ত্রিশ নম্বর প্লটে থামল। দু'পাশের ডালা খুলে ইট নামানো শুরু হ'ল। দাসমশাই খুশি হয়ে এগিয়ে এসে ইট দেখামাত্র বুঝলেন, চিমনী-ভাটার একনম্বরী ইট। সুন্দর পোড়া, টকটকে লাল রং, ওজনে হালকা, সমান সাইজ। দেশী ভাটার ইটের মতো ম্যাটম্যাটে রঙের বেঢপ ভারি না। দেশী ইটে মুর্শিদাবাদী মিস্ত্রী কাজ করতে চায় না। খিটখিট করে। হাতে তুলে বলে, 'একি ইট বাবু, না মাটির ড্যালা? দেখুন, মজা দেখুন—,' কর্নি দিয়ে আলগোছে ঘা দেয়। ওমনি আস্ত ইটখানা ভেঙ্গে খোয়া! মিস্ত্রি বলে, 'দেখলেন তো? এই ইটে পাচিল-মাচিল গাঁথুন, ঘর গাঁথবেন না—'

চিমনীর ইটে কর্নি ঠেকলে টং করে শব্দ ওঠে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যেমন কাটতে চাও কাটা যায়। ওজনে হাল্কা বলে হাতে ধরে কাজ করতে সুবিধা, কাজ এগোয় তাড়াতাড়ি। তাছাড়া প্লাস্টার না করেও ক'বছর গাঁথনি ফেলে রাখা যায়। জলেঝড়ে ক্ষতি হয় না, নোনা ধরে না। বরং ভিজলে আরো শক্ত হয়ে ওঠে। চিমনীর ইট দেখলে মিস্ত্রির মন মেজাজ ফুরফুরে হয়ে যায়! দাসমশাই সব জানেন। সব দেখেছেন। এসব ইট কাঠ বালি নিয়েই চল্লিশ বছরের চাকরি-জীবন তাঁর!

এগিয়ে এসে একখানা ইট হাতে তুলে নিলেন। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভালো

করে দেখে নাকের কাছে এনে গন্ধ শুঁকলেন। ভাবখানা এমন যেন ফুলের গন্ধ শুঁকছেন! তারপর আবার নামিয়ে রেখে কুঁজো হয়ে বুড়ো আঙুল দিয়ে ইটের গা ঘষতে ঘষতে বললেন, 'একটু খরখরে ঠেকছে যেন। বালিমাটি মনে হয়!'

কুলিরা শব্দ করে ইট নামাতে লাগল। কেউ জবাব দিল না। দাসমশাই এবার পাজামা পাঞ্জাবি পরা ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হেড্‌মাস্টারবাবুর ইট বুঝি? বিষ্যুৎবারে ভিৎ কাটাবেন? ভালো, ভালো! তা কি দর নিল ভাই?'

দাম শুনে দাসমশায়ের মন খারাপ হয়ে গেল। হাজারপ্রতি দশটাকা বেড়ে গেছে। ওদিকে চুণ পাথর লোহার দামও বাড়ছে। কাল এক দোকানে কোয়াটার ইঞ্চি শিকের দর জিজ্ঞেস করেছিলেন। এক কুইন্টল এখন ষাট থেকে নব্বই হয়ে ঠেকেছে। প্রতিদিন এ ভাবে দর বেড়ে চললে দাসমশাই কি দিয়ে কি করবেন! তাঁর টাকার সুদ তো শতকরা সেই সাড়ে তিন টাকা! দাসমশাই ছেলেকে আবার লিখলেন। এবার সে জবাবই দিল না।

তিন চারদিন পর হেড্‌মাস্টার বনমালীবাবুর বাড়ির কাজ শুরু হয়ে গেল। একটু বেলায় দাসমশাই এসে দেখলেন, দু'জন মিস্ত্রি কুলি-কামিন নিয়ে ভিৎ কাটার যোগাড় করছে। ছাতা মাথায় বনমালীবাবু একপাশে দাঁড়িয়ে আছেন। মিস্ত্রি দু'জন মাটিতে পেতে নীলকাগজে-আঁকা বাড়ির নকশা দেখছে। দাসমশাই লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে এসে ঝুঁকে পড়লেন, 'কি হ'ল মিস্ত্রি? কিছু গোলমাল ঠেকছে?'

একজন বলল, 'এই এইখানটায় একটু…'

দাসমশাই বললেন, 'কই দাও, দাও দেখি আমাকে একবার।'

মিস্ত্রিদের হাত থেকে নকশা নিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন দাসমশাই। তারপরই রাগ-রাগ মুখ করে বলে উঠলেন, 'প্ল্যানখানা তো ঠিকই আছে, খুব পরিষ্কার! এই তো ভিতের মাপজোখ সব লেখা আছে!'

একজন মিস্ত্রি কি বলতে চাইল। দাসমশাই তাকে ধমকে উঠলেন, 'কোন্ গাঁয়ের মিস্তিরি হে তোমরা? এমন সুন্দর প্ল্যান, মাটিতে ফেলতে পারছ না! ফিতে আছে? বড় ফিতে? দাও আমাকে।'

বনমালীবাবু ভদ্রতা করে বললেন, 'আহা থাক্, আপনি বুড়োমানুষ!'

চামড়ার খাপ থেকে ফিতে টানতে টানতে দাসমশাই হাসলেন, 'কিছু ভাববেন না মাস্টারমশাই! এখুনি দাগ টানা হয়ে যাবে। এই আমার কাজ ছিল। চল্লিশ বছর ধরে এই করেছি আমি!' শুনে বনমালীবাবু অবাক হয়ে তাকালেন। ময়লা গেঞ্জি আর ছেঁড়া ধুতি লুঙ্গির মতো ভাঁজ করে পরা কালো

লম্বা মানুষটার উপর এতক্ষণে যেন তাঁর সম্ভ্রম জাগল। নরম গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কি কাজ করতেন আপনি? কোন্ অফিসে?'

দাসমশাই বললেন, 'শুনবেন, বলব সব আস্তে আস্তে। কই হে, খুঁটিগুলো রেডি কর তোমরা...'

ভিৎ খোঁড়া হ'ল। খোয়া ঢেলে চুনের জল ছিটিয়ে তিনদিন ধরে দুরমুজ করাও হ'ল। তারপর শুরু হ'ল গাঁথনির কাজ। ধূ ধূ ডাঙা জমি মিস্ত্রি মজুরের হাঁকডাক আর গরুর গাড়ির চাকার শব্দে সচকিত হয়ে উঠল। দাসমশাই যেন দীর্ঘকাল বেকার থাকার পর হঠাৎ একটা কাজ পেয়ে গেলেন। সকাল হতে না হতে টায়ারের চটি পায়ে ছাতা বগলে চলে আসেন। তারপর বনমালীবাবুর ভিতের কাছে দাঁড়িয়ে ব্যস্তভঙ্গিতে চেঁচামেচি শুরু করেন, 'কি হল মিস্তির, এখনো ইট ভেজাওনি? মশলা মাখোনি? বাবুকে দেখছি তোমরা পথে বসাবে!'

তারপর ক'দিন যেতে না যেতেই দেখা যায়, বনমালীবাবু আসছেন সেই দুপুরে, খেয়ে-দেয়ে পান চিবুতে চিবুতে। দাসমশাই তখন ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুরে ছাতা মাথায় টিনের বালি কিংবা পাথরের মাপ বুঝে নিচ্ছেন আর বড়জোড়ার পাঁচু কিংবা আলুন্দের হানিফকে সমানে ধমকে যাচ্ছেন, 'তোদের চালাকি আমি জানি না? কাং করে টিন ধরে রাখিস, ভেতরে আধখানা খালি থেকে যায়। এক টিনের মাল দু'টিনে ভরিস। বাবা, আমার সঙ্গে ফেরেব্বাজি। সোজা করে মাটিতে ফেল টিন, ফেল বলছি...'

সাইকেল রেখে এসে বনমালীবাবু বলেন, 'সর্বনাশ, এখনো খেতে যাননি দাসমশাই? সূয্যি কোথায় গেছে দেখুন।'

দাসমশাই বলেন, 'আপনি না এলে যাই কি করে। একটু চোখের আড়াল হলেই তো মিস্ত্রিরা হাত গুটিয়ে বিড়ি ফুঁকতে বসবে।'

বনমালীবাবু বলেন, 'যান, যান। আর দেরী করবেন না।'

দাসমশাই যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়ান। দ্রুত ক'পা পিছিয়ে এসে একজন মিস্ত্রিকে ধমকে ওঠেন, 'ও কি করলে হে কাসেম? জোড়ের মুখে আধলা ইট গুঁজে দিলে? কেমনতরো মিস্তিরি তুমি? বাপঠাকুরদার তালিম পাওনি বুঝি? পাঁচিল গাঁথার হাত নিয়ে বাড়ি গাঁথতে চলে এসেছ। ওঠাও, ওঠাও। আধলা উঠিয়ে গোটা ইট দাও সব।'

ভাতের গ্রাস মুখে তুলতে তুলতে দাসমশাই ভাবেন, তিনি যখন বাড়ি করবেন ওই কাশেমকে কিছুতেই লাগাবেন না। বেটা মুনিষের বেহদ্দ, কর্নি

হাতে নিলেই মিস্ত্রি হওয়া যায় না। কোত্থেকে যে জোটালেন বনমালীবাবু! দাসমশাই না দেখলে বাড়ির বারোটা বাজিয়ে দিত একেবারে! বরং ওর সঙ্গী ঈশাকের হাতটা ভালো। মাপ-টাপ বোঝে। দাসমশাই ঈশাককে লাগাবেন। ছোট বাড়ি তাঁর, একজন মিস্ত্রিই যথেষ্ট।

এদিকে বনমালীবাবুর বাড়ি উঠতে উঠতে ডাঙায় আরো তিনটে বাড়ি শুরু হয়ে যায়। রেলের বুকিং ক্লার্ক হর্ষনাথ, পোস্টঅফিসের কেবানি ত্রিলোচন, জজকোর্টের রেকর্ডকীপার পতিত সাহা প্রায় একযোগে কাজ শুরু করে। সার বেঁধে গরুর গাড়িতে ইট আসতে থাকে। কখনো ট্রাকে বালি আসে। নির্জন ডাঙা আরো জমকালো হয়ে ওঠে। দু'চারদিনের মধ্যে দাসমশায়ের চল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতার কথা সকলের কানেই পৌঁছে যায়। তারপর দেখা যায় দাসমশাই ছাড়া কোনো বাড়ির কোনো কাজই ঠিকমতো হয় না।

ত্রিলোচন এসে বলে, 'মেসোমশাই, ভিতে ত্রিশ ইঞ্চি তিনখানা ইট গেঁথেছে, এবার একখানা কমিয়ে দিই?'

হর্ষনাথের মিস্ত্রি এসে বলে, 'পায়খানার চেম্বারের তলায় ক'ইঞ্চি ঢালাই দেব বুড়োবাবু? চার ইঞ্চি দিলে হবে?'

পতিত এসে বলে, 'বিশহাত খোঁড়া হয়েছে কুয়ো। অনেক জল। আর হাত দুই খুঁড়ব মেসোমশাই?'

লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে যান দাসমশাই, একবার এখানে, একবার ওখানে। হর্ষকে ধমক দিয়ে বলেন, 'একি করছ হর্ষ, বাংলা-ইট দিয়ে কুয়ো গাঁথছ? এক বছরেই গলে যাবে যে। মাস্টারবাবুর মতো দু'ট্রাক চিমনীর ইট আনালে না কেন? পতিতের মিস্ত্রিকে বলেন, 'তোমাদের সিমেণ্টটা এতো সাদা লাগছে কেন হে? গঙ্গামাটি না তো? আলাদা করে একটু জমিয়ে দেখ দেখি।' ত্রিলোচনের একজন মুনিষকে ছাতা উঁচিয়ে মারতে যান, 'হারামজাদা, সেই তখন থেকে ঠ্যাং ছড়িয়ে বিড়ি টানছিস! পয়সা দেয় না বাবু? মাগনা খাটিস?'

দুপুর গড়িয়ে যেতে থাকে। সূর্য মাথার উপর থেকে পশ্চিমে সরে যায়। হরিবালা পাড়ার কোনো ছেলেকে পাঠিয়ে দেন। দাসমশাই গ্রাহ্যই করেন না। বলেন, 'এইতো বনমালীবাবুর ওখানে পাউরুটি দিয়ে চা খেলাম। যাচ্ছি, একটু পরে যাচ্ছি।' ঘণ্টাখানেক বাদে আবার কে আসে। দাসমশাই বিরক্ত হয়ে তাকে ধমক দেন, 'কি করে যাই বল দেখি? ত্রিলোচন তো এখনো এল না! এদিকে লিণ্টেল ঢালাই চলছে…'

—৫

যেন পুরনো দিনের মতো শরীর-স্বাস্থ্য ফিরে পেয়েছেন দাসমশাই। কি উৎসাহ! কি দাপট! ডাঙার হু হু বাতাসে ছাতা ধরে কাজ দেখতে অসুবিধা হয় বলে ছাতা ছাড়লেন। মাথায় ভিজে গামছা চাপিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঘুরতে লাগলেন। সকলের দেওয়া চা পাউরুটি পান সিগেরেটে আপ্যায়িত হয়ে দুপুরের স্নান-খাওয়ার কথা প্রায় ভুলেই গেলেন।

বনমালীবাবুর মিস্ত্রি দেয়াল বাঁকা গেঁথেছে। চোখে দেখেই বুঝতে পারলেন দাসমশাই। অস্বীকার করায় মিস্ত্রির উপর আরো রেগে উঠলেন, 'বার কর ওলন, এখুনি বার কর। আমার সঙ্গে চালাকি!' নিজেই মাচার ওপর উঠে সুতো খুলে ওলন ঝুলিয়ে দিলেন। ভারি পেতলের মাথাটা দুলে দুলে স্থির হওয়া মাত্র দাসমশাই গর্জে উঠলেন, 'এবার — এবার কি হ'ল ঈশাক? কানা তো নও, নিজের চোখেই দেখ!'

ঈশাক লজ্জা পেয়ে বলল, 'আধ ইঞ্চিটাক বেঁকেছে। পালাস্টারে ঠিক করে দেব বুড়োবাবু।'

দাসমশাই খেঁকিয়ে বললেন, 'কেন? এমন জোড়াতালির কাজ কর কেন তুমি? এ সব চালবাজি ঠিকেদারিতে হয়। আমিও অনেক করেছি। তাই বলে নিজের বসতবাটীতে গোঁজামিল চালাবে? আসুক হেডমাস্টার!'

ঈশাক একটু চুপ করে থেকে বলল, 'বুড়োকর্তার নজর খুব! আপনার কাছে থাকলে কাঁচা মিস্তিরিও পাকা হয়ে উঠবে।'

প্রশংসায় খুশি হলেন দাসমশাই। চোখে হাসির ভঙ্গি ফুটিয়ে বললেন, 'তবে? বোঝ! চল্লিশ বছর কাজ করেছি এই লাইনে। অনেক ওভারশিয়ার ইঞ্জিনীয়ারের কান কাটতে পারি আমি! আমার বাড়িতে তোমাকে লাগাব ঈশাক! তখন কিন্তু এমন তাপ্পিপট্টি চলবে না।'

ঈশাক বিড়ি বের করল। দাসমশাইকে একটা দিয়ে বলল, 'আপনার বাড়ি কবে শুরু করবেন বাবু?'

'করব। শীগ্‌গিরই করব।' বলতে বলতে বাজপড়া খেজুর গাছের চিহ্ন ধরে নিজের দু'কাঠা তিনছটাক জমির দিকে তাকালেন দাসমশাই। মুখখানা গম্ভীর হয়ে উঠল। বুকের মধ্যে কেমন একটা কষ্ট অনুভব করলেন। বিড়ির ধোঁয়া গিলে কাসতে কাসতে ত্রিলোচনকে ডেকে বললেন, 'ইটের দর কত বাড়ল হে? আর তিন সুতোর লোহা?'

একদিন ডাঙায় একটা গাড়ি এসে থামল। ধূসর রঙের নতুন গাড়ি।

পণ্ডিতের ওখানে দাঁড়িয়ে কাজ দেখছিলেন দাসমশাই, শব্দ শুনে ঘাড় উঁচু করে তাকালেন। ভালো বুঝতে পারলেন না। হর্ষনাথকে ডেকে বললেন, 'এই বেহ্মডাঙায় গাড়ি হাঁকিয়ে কে এল গো হর্ষ?'

হর্ষনাথ ভালো করে দেখে মুখ কালো করল, 'বড়জোড়ার সিতিকণ্ঠবাবুদের গাড়ি, মেসোমশাই।'

সিতিকণ্ঠের নাম শুনে দাসমশায়ের ভুরু কুঁচকে উঠল, চোয়ালের হাড় শক্ত হয়ে গেল। বড়জোড়ার জমিদার ওঁরা। তিন ভাইয়ের মধ্যে সিতিকণ্ঠ ছোট। ইনি কনট্রাক্টরি করেন। শহরে মস্ত বাড়ি, সাজানো অফিস। চাকরি চলে গেলে দাসমশাই একবার সিতিকণ্ঠের কাছে গিয়েছিলেন—একটা কাজ যদি জোটে এই আশায়! কিন্তু তাঁর চল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতার কোনো দাম দেওয়া দূরে থাক বয়সের সম্মানটুকু পর্যন্ত দিলেন না সিতিকণ্ঠ। অফিস-ঘরের কাজকর্মের ব্যস্ততার মধ্যে একরকম জোর করে ঢুকে পড়েছিলেন বলে সম্ভবত খুব বিরক্ত হয়েছিলেন তিনি। কে তাকে ঢুকতে দিল জিজ্ঞেস করে নাকে নস্যি গুঁজতে গুঁজতে বলে উঠেছিলেন, 'এই বয়সে আর চাকরি খোঁজা কেন বাপু! শ্মশানের দিকে মুখ করে মালা জপোগে, আখেরে কাজ হবে।'

সিতিকণ্ঠকে ঘিরে যারা বসেছিল তারা হেসে উঠল। লজ্জায় অপমানে দাসমশায়ের খাড়া শরীরটা কুঁজো হয়ে পড়ল। একঘর লোকের সামনে নিজেকে একটা হাভাতে ভিখিরি বলে মনে হ'ল। মানুষকে মানুষ অকারণে কেন আঘাত দেয়, অপমান করে, এতে কি সুখ, কি লাভ হয় ভাবতে ভাবতে দাসমশাই রাস্তায় নেমে পড়লেন। সেই সিতিকণ্ঠবাবু গাড়ি নিয়ে ডাঙায় কেন এসেছেন? কি মতলব!

দাসমশাই হর্ষনাথের বাড়ির কাছে এসে দাঁড়ালেন। মিস্ত্রি লোহা কাটছিল, তাকে বললেন, 'ওই লোহাখানা বাদ দাও মথুর। বড় বেশী টেম্পার দেওয়া, রিং হবে না।' তারপর গলা তুলে ত্রিলোচনকে ডাকলেন। সবাই জড়ো হলে বললেন, 'বড়জোড়ার ছোটবাবু কেন আসছে বল দেখি?'

দেখা গেল ত্রিলোচন অনেক কিছু জানে। নতুন হাসপাতালের গায়ে ডাক্তার-নার্সদের না-কি কোয়ার্টার হবে। সেচ-বিভাগের নতুন কলোনীর একটা অংশও এসে ঠেকবে এই ডাঙায়। ইলেকট্রিক আসবে, পাম্পের জল আসবে, পাকারাস্তা পাকাড্রেন হবে। তখন ওই কলোনীর টানে টানে এই ডাঙাজমির দাম বাড়বে হু হু করে। সব বাড়িঘর তৈরিরই কনট্রাক্ট সিতিকণ্ঠ পেয়েছেন। সেই সঙ্গে ডাঙার প্লটগুলোও তিনি কিনে ফেলতে চান। ইতিমধ্যে সাত

আটটা প্লট তাঁর হাতে চলে গেছে। সব শুনে দাসমশাই অবাক হয়ে বললেন, 'তলে তলে এমন কাণ্ড! টের পাইনি তো!'

ত্রিলোচন রাগ করে বলল, 'হ্যাঁ, মেশোমশাই। এখানেও জমি নিয়ে ফাটকাবাজি শুরু হয়ে গেছে।'

দাসমশাই বললেন, 'সিতিকণ্ঠ কোন্ কোন্ প্লট কিনেছে জান?'

চার-পাঁচটা জমির নাম করল ত্রিলোচন। দাসমশাই হিসেব করে দেখলেন তাঁর পশ্চিমের সাড়ে তিন কাঠার প্লটটা, একজন নার্স যেটা কিনেছিল, সেটা সিতিকণ্ঠের দখলে চলে গেছে। দুশ্চিন্তায় মুখ কালো করে কি যেন ভাবতে লাগলেন দাসমশাই। তারপর নিজের জমিটুকুর দিকে হাঁটতে হাঁটতে বললেন, 'আমার সীমানার চারকোণায় বেশ শক্তপোক্ত চারটে পিলার গেঁথে দিও তো মথুর। ইট ক'খানা মাস্টারবাবুর কাছ থেকে নিও, আর মশলাটা হর্ষর কাছ থেকে। গর্ত খুঁড়ে খুঁড়ে আর পারি না, জলেকাদায় বুঁজে যায়।'

এক একদিন ভরদুপুরে কড়কড় করে মেঘ ডেকে ওঠে। ঘন কালো হয়ে ওঠে আকাশের মুখ। ফাঁকা ডাঙায় বাতাসের দাপাদাপি শুরু হয়ে যায়। দাসমশাই চিৎকার করতে থাকেন, 'ও ঈশাক, সিমেন্টের বস্তাখানা ঢাকা দাও। ও পতিত, ঢালাই থামিয়ে ত্রিপলের খোঁজ কর।'

হর্ষ বলে, 'আপনি নামুন শীগ্গির মাচা থেকে, ঝড়ে উল্টে যাবেন।'

দাসমশাই মাচা থেকে নামতে নামতে বলেন, 'এ আর কি ঝড় গো। সেবার হুগলীতে চারতলা এক বাড়ির ছাদ ঢালছি, গঙ্গা থেকে ঝড় এল ক্ষেপা মোষের মতো। যেমন জোর, তেমন আওয়াজ! মাচা ভেঙে টিন-পাটা বাঁশ-দড়ি কোথায় উড়ে গেল। সেই সঙ্গে একটা কমবয়েসি কামিন—'

একটুপরেই বাতাস থেমে যায়। ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামে। রোগা লম্বা শরীরখানা নিয়ে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকেন দাসমশাই। কেউ দৌড়ে একখানা ছাতা এনে দেয়। ডাঙাজমির এখানে ওখানে জল দাঁড়িয়ে যায়। সেই ঘোলা জলে বাচ্চাদের মতো ঝপঝপ করে হাঁটতে থাকেন দাসমশাই। নিজের দু'কাঠা তিনছটাক জমির উপর এসে দাঁড়ান। কোথায় কোথায় জল জমেছে লক্ষ্য করেন। এখন চারকোণায় ইট-সিমেন্টের উঁচু পিলার গাঁথা। পুরনো গর্তগুলো জলের তলায় ডুবে গেছে! একটা পিলারের কোণায় চোট লেগে একটুখানি বুঝি ভেঙেছে। কে ভাঙল? দাসমশাই রেগে ওঠেন। 'ও মথুর, পিলারখানা কে চটাল দেখেছ? দেখনি? নিশ্চয়ই গরু-চরানো বাগাল-গুলো! কই শালোরা, কোনদিকে গেল?'

নিজেই একখানা কর্নিতে মশলা তুলে মেরামতের জন্য এগিয়ে যান। মথুর বলে, 'ও বেলা আমি সেরে দেব বুড়োবাবু। আপনি কেন কষ্ট করেন?'

দাসমশাই বলেন, 'থাম তুমি! কর্নি ধরা আমার অভ্যেস আছে। ইচ্ছে করলে তোমাদের চেয়ে ভালো বাড়ি গাঁথতে পারি আমি।'

সন্ধ্যার মুখে গাঁয়ে ফেরার পথে ভাবেন, সকলের কাছ থেকে কিছু আধলা ইট নিয়ে জমির পুবে গোলাকার দুটো খাঁচার মতো করবেন। তার মধ্যে দুটো কলমের আমচারা বসিয়ে দেবেন। বাড়ি যখন হয় হবে, এখন গাছ দুটো তো বাড়ুক। তারপরই মনে পড়ে, পুবে দারোগার জমি! গাছ লাগানো ঠিক হবে না। ডালপালা ও-পাশে ছড়িয়ে গেলে ঝামেলা বাঁধাবে, নয়তো ফল-ফলান্তি সব লুটে খাবে। তবে কি পশ্চিমে? ও দিকটা তো সিতিকণ্ঠ কিনে রেখেছেন। এরপর হাতবদল হয়ে কোন্ চামারের খপ্পরে পড়বে কে জানে! তাহলে কোন্ দিকটায় বসাবেন?

রাত্রিবেলায় টিমটিমে লণ্ঠনের আলোতে পুরনো নক্সাখানা বাতিল করে আবার নক্সা আঁকতে বসেন দাসমশাই। পুব থেকে রান্নাঘর আর কুয়ো সরিয়ে পশ্চিমে আনেন। দক্ষিণমুখী-ঘরের জানালাটা আরো একফুট উপরে তুলে দেন। আটফুট রাস্তার ধারে ঘরের ঠিক সামনেই গাছ বসানোর জায়গা বের করেন। আবার আলাদা করে ইট বালি লোহা সিমেণ্টের হিসেব কষেন। পোস্টাফিসের পাশবইখানা বের করে লাল কালিতে যোগ-করা সুদের পরিমাণটা দেখেন। তারপর আলো নিবিয়ে অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকেন। জিনিসপত্রের যা দাম বেড়েছে তাতে এখন একখানা ঘরের ইটের দামই হয় না! এইসময় ছেলের উপর অসম্ভব রাগ হয় দাসমশায়ের। মাসে মাসে দশ পনেরোটা টাকা বাড়তি কেন পাঠায় না সে? বাড়ি হলে তো তার ছেলেমেয়েবউয়ের জন্যই হবে! দাস-মশাই আর ক'দিন ভোগ করবেন? বউমাটা কি কোনো মন্ত্র দিয়েছে কানে? না-কি মদটদ খেতে শিখেছে নাড়ু? কলেকারখানায় কাজ করে, বিশ্বাস কি! এবার কেউ কলকাতা গেলে চুপিচুপি খবর আনানোর চেষ্টা করবেন দাসমশাই। তেমন বুঝলে নিজেই যাবেন!

ছাদ ঢালাইয়ের আগে বনমালীবাবুর বাড়ি হঠাৎ থেমে যায়। দাসমশাই অবাক হয়ে বলেন, 'কি হ'ল মাস্টারমশাই, কাজ বন্ধ?'

বনমালীবাবু বিষণ্ণ গলায় বলেন, 'পুঁজি শেষ দাসমশাই! এখন আর হ'ল না।'

দাসমশাই বলেন, 'বাড়ির কাজ ফেলে রাখলেই লোকসান। বাঁশ দড়ি পচে যাবে, চুণবালি ধুয়ে যাবে।'

'কি করি? ধার দেনায় ডুবে গেছি, আর উপায় নেই। দেখি সামনের বছর।' বলতে বলতে চারদিকে তাকিয়ে গলার স্বর নামিয়ে আনেন বনমালীবাবু, 'আসলে কি জানেন দাসমশাই? চুরি-চামারির পয়সা না হলে এ বাজারে ঘরবাড়ি করা যায় না। ওই যে দেখুন লেডী ডাক্তারকে—কেমন দোতলা হাঁকাচ্ছে দেখুন! কিসের পয়সা জানেন দাসমশাই? সব ইল্লিগ্যাল এবোরশান্ কেসের!'

বাড়িটা ডাঙায় নয়, নতুন হাসপাতালের রাস্তায়। কিন্তু ডাঙায় দাঁড়িয়ে দেখা যায়। সেদিকে একবার তাকিয়ে ঘন ঘন মাথা নাড়েন দাসমশাই, 'কথাটা মিথ্যে বলেননি মাস্টারমশাই। যে যত চোর তার বাড়িঘর জমিজমা তত তাড়াতাড়ি বাড়ে!'

কনট্রাক্টটার শৈল চৌধুরীর কথা মনে পড়ে এইসময়। কত সামান্য পুঁজি নিয়ে শুরু করেছিলেন। তারপর সরকারী লোহা সিমেণ্ট সরিয়ে, মালমশলা চুরি করে, গাঁথনিতে-ঢালাইয়ে দেদার ফাঁকি দিয়ে ক'বছরেই ফুলে ফেঁপে ঢোল হয়ে গেলেন। এখন তাঁর ছেলেদের হাতে লাখ লাখ টাকা, দামি দামি গাড়ি! আর দাসমশাই? ওই ফার্মের চল্লিশ বছরের নিষ্ঠাবান সেবক? কি হ'ল তাঁর? কি পেলেন তিনি? সহকর্মীদের পরামর্শ শুনে তিনিও যদি দু'এক বস্তা সিমেণ্ট চুরি করতেন কিংবা হাজিরা-খাতায় বাড়তি মিস্ত্রি-মুনিষ দেখিয়ে কিছু পয়সা করে রাখতেন—তাহলে আজ তাঁর একখানা ঘর কি উঠত না!

ঈশাক বলে, 'এ কাজ তো বন্ধ হয়ে গেল। আপনার বাড়িটা শুরু করুন বড়োবাবু, লেগে যাই!' দাসমশাই সহসা কোনো জবাব দিতে পারেন না। বাজপড়া গাছটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলেন, 'করব ঈশাক! শিগ্‌গিরই শুরু করব। তুমি খোঁজ নিও মাঝে মাঝে।'

ডাঙায় সবচেয়ে ছোট বাড়ি ত্রিলোচনের। কোনোরকমে একখানা ঘর আর একফালি বারান্দা শেষ করেছে। তাতেই তিন হাজার টাকা খরচ। মেঝে শেষ করে দরজা জানালার পাল্লা লাগানোর পর ত্রিলোচন বলে, 'বাকি যা থাকল, পরে হবে। লোন্ শোধ করে ফের লোন্ তুলতে হবে অফিস থেকে। এখন চলে আসি।'

দাসমশাই বলেন, 'নিশ্চয় আসবে! আরে, নিজের বাড়ির উঠোনে ধুলোয় গড়াগড়ি দিয়ে শুয়ে থাকলেও সুখ। দেরী করো না, এই বিষ্যুৎবারেই সকালের

দিক করে চলে এস।'

ত্রিলোচন বলে, 'তাই আসব মেসোমশাই।'

দাসমশাই খুব খুশি হয়ে পতিতের ওখানে সেণ্টারিং-এর কাজ দেখতে এগিয়ে যান। কিন্তু ক'পা এসেই থমকে পড়েন। তাঁর জমির ভেজা-মাটিতে গাড়ির চাকার দাগ! কার গাড়ি? আর তো ট্রাকে মাল আসেনি এদিকে? তাছাড়া এটা ট্রাকের না, ছোট গাড়ির চাকার দাগ। দাসমশাই বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন, 'ও পতিত, আমার জমি দিয়ে গাড়ি চালাল কে?'

হর্ষনাথের ওখান থেকে বাসু জবাব দেয়, 'বড়জোড়ার ছোটবাবুর গাড়ি, কর্তা! ভোর-ভোর এসেছিল, আমি দেখেছি।'

সিতিকণ্ঠের নাম শুনে দাসমশাই জ্বলে ওঠেন, 'কেন, আমার জমি দিয়ে কেন গেল? এটা কি সরকারী রাস্তা, না বেওয়ারিশ জমি? যদি পিলার ভেঙে যেত একখানা? দিত করিয়ে? তুই আমাকে কিছু কাঁটাগাছ এনে দিস তো বাসু! চারদিকে পুঁতে দেব।'

সেইদিনই বাড়িতে ফিরে একখানা চিঠি পান দাসমশাই। কলকাতা থেকে ছেলের চিঠি। পড়তে গিয়ে তাঁর হাত কেঁপে ওঠে, নিঃশ্বাস আটকে যায়। হরিবালা বলে, 'কি হ'ল? কি লিখেছে নাড়ু?' দাসমশাই জবাব দিতে পারেন না। স্ত্রীর দিকে ঘোলাটে চোখ তুলে তাকিয়ে থাকেন।

পরের দিন হর্ষনাথ বলে, 'কি হয়েছে মেশোমশাই? মুখখানা বড় শুকনো দেখাচ্ছে?'

দাসমশাই বলেন, 'বড়ো বিপদ। ছেলে লিখেছে, এমাসে সংসার খরচের টাকা পাঠাতে পারবে না।'

'সে-কি মেশোমশাই! কেন?'

'কারখানায় গোলমাল। বিশ তারিখ থেকে না-কি লকআউট হয়েছে। এই তো দেখ না চিঠিখানা, সঙ্গে করেই এনেছি।'

হর্ষনাথ চিঠি পড়ে বলে, 'বুঝেছি, কলকারখানায় আজকাল ওসব হরদম হয়। কিছু ভাববেন না আপনি। ছেলে তো লিখেছে, সবাই মিলে কারখানা ঘিরে বসে আছে, না খুলিয়ে ছাড়বে না।'

দাসমশাই বলেন, 'ঘিরে থাকলে কি হবে। ধরতে গেলে ওরা তো সেই কুলি-মজুরই। ওদের কথা কে শুনবে?'

হর্ষনাথ বলে, 'না মেশোমশাই, সব কারখানাতেই এখন ইউনিয়ন আছে। ভারি শক্ত ইউনিয়ন। দেখবেন মালিককে ঘায়েল করে ছাড়বে।'

খুব জোর দিয়ে কথাগুলো বলে হর্ষনাথ। কাছেই আমেদপুরের চিনির কল এই সেদিনও ক্লোজারের মত কি একটা হয়েছিল। তারপর সব ওয়ার্কাররা মিলে কি-ভাবে অফিসারদের লাল চোখ ঠাণ্ডা করে দিয়েছিল, তার কথাও বলে। কিন্তু দাসমশাই তেমন জোর পান না। তাঁর কেবল মনে পড়ে, এ মাসে কোনো মনিঅর্ডার আসবে না। সংসার চালানোর জন্য সঞ্চিত টাকায় হাত দিতে হবে। কষ্ট করে টাকা ক'টা জমিয়ে রেখেছেন তিনি। মাসের শেষে একবেলা উপোস দিচ্ছেন, জামা ছিঁড়ে গেছে, গেঞ্জি গায়েই চালিয়ে দিচ্ছেন, তিনমাস একজোড়া টায়ারের চটিও কেনেননি। এখন ওই টাকা ভেঙে তাঁকে দু'বেলা দুটো ডালভাতের সংস্থান করতে হবে। আস্তে আস্তে এসে দাঁড়ান পণ্ডিতের ওখানে। মশলাটা ঠিকমতো মাখা হচ্ছে না দেখেও চেঁচামেচি করেন না। কেমন নিস্তেজভাবে বলেন, 'বড় বালি-বালি ঠেকছে। আর আধ কড়াই সিমেন্ট দাও ভিখু।'

ও পাশে আরো একখানা নতুন বাড়ি শুরু হয়েছে। তার মিস্ত্রি এসে বলে, 'বুড়োকর্তা একবার আসুন। সিঁড়িকোঠাব জায়গাটা একটু দেখে দেবেন।'

দাসমশাই বলেন. 'কি আর দেখব ? যেমন ম্যাপে আছে করগে।'

হর্ষনাথ এসে বলে, 'এই দেখুন কত বড়বড় পাথর এনেছে—এক ইঞ্চি মোটা।'

দাসমশাই পাথরঅলাকে গালমন্দ করার জন্য ছুটে যান না। সিমেন্টের বস্তার উপর কুঁজো হয়ে বসে থেকে বলেন, 'এ পাথরে রাস্তা হয়. ছাদ হয় না! ফেরৎ দাও গে।'

একটু পরে বনমালীবাবু তাঁর ফেলে-রাখা আধখানা-বাড়ি দেখতে আসেন। ক'দিনের রোদবৃষ্টিতে গাঁথনির কি ক্ষতি হ'ল, ঝড়েবাতাসে কতখানি বালি উড়ল, ক'টা ইট ভাঙল এসব দেখেশুনে দাসমশায়ের কাছে এসে বলেন, 'কি ব্যাপার দাসমশাই ? চুপ করে বসে আছেন ? শরীর খারাপ না-কি!'

দাসমশাই বলেন, 'আর শরীর! এখন মরলেই বাঁচি!'

বনমালীবাবু জোরে জোরে মাথা ঝাঁকান, 'না, দাশমশাই না, ও কথা বলবেন না। আপনি না থাকলে এই ডাঙার মানুষগুলোর ঘর কে বেঁধে দেবে?' তারপর গম্ভীর চিন্তাক্লিষ্ট মুখে বলেন, 'ডাঙায় নতুন ঘর আর বেশী উঠবে না দাসমশাই। শুনছি প্রায় সব প্লটই সিতিকণ্ঠবাবুর হাতে চলে গেছে। উনি কি আর বাড়ি করবেন! ফেলে রেখে শুধু জমির দাম তুলবেন।'

দাসমশাই হঠাৎ প্রশ্ন করেন, 'লকআউট আর ক্লোজার কি এক মাস্টার-মশাই? কতদিন থাকে?'

বনমালীবাবু অবাক হয়ে বলেন, 'কেন বলুন দেখি?'

দাসমশাই বলেন, 'আমার ছেলের কারখানায় লকআউট হয়েছে।'

একটু চুপ করে কি যেন ভাবেন বনমালীবাবু, তারপর বলেন, 'ও-সব কল-কারখানার বিষয় আমি ঠিক জানি না। তবে লকআউট, ক্লোজার এ-সব খুব খারাপ ব্যাপার দাসমশাই। একবার হলে আর খুলতেই চায় না। কারখানাই না-কি উঠে যায় অনেক সময়...'

শুনে দাসমশায়ের সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা হয়ে আসে। ভাঙাচোরা তামাটে মুখখানা নিয়ে অসহায়ভাবে তিনি বনমালীবাবুর দিকে তাকিয়ে থাকেন। যদি সত্যি কারখানা অনেকদিন বন্ধ থাকে, ছেলে টাকা না পাঠায়, তাহলে কি হবে? কিংবা কারখানাটা যদি একেবারে উঠে যায়, তাহলে? নতুন করে ছেলে আবার কোথায় কাজ পাবে? কবে পাবে? দাসমশায়ের সম্বল বলতে তো ওই সামান্য ক'টা টাকা। ফুরিয়ে গেলে তারপর? ওই দু'কাঠা তিন ছটাক জমিটুকুও বিক্রি করতে হবে?

...নিজের জমিতে এসে দাঁড়ালেন দাসমশাই। বাজে পোড়া শুকনো খেজুর গাছটা দেখলেন, মাটিতে দেখলেন সিতিকণ্ঠের গাড়ির চাকার দাগ। একটা অদ্ভুত কষ্ট ঠেলে ঠেলে উঠতে লাগল আর সেই সঙ্গে চাকার দাগটা যেন গভীরভাবে বুকের মধ্যে বসে যেতে লাগল।

দাসমশাই হাঁ করে নিঃশ্বাস টানলেন।

এখন প্রেম

হলের সামনে দাঁড়িয়ে ঘন ঘন ঘড়ি দেখছিল সীতেশ। আর মাত্র পাঁচ মিনিট। অথচ কৃষ্ণার পাত্তা নেই। মাসের প্রথম রবিবারে একটা সিনেমা দেখে ওরা। সদ্য মাইনে-পাওয়া পকেট কেরানী সীতেশকে এই শৌখিনতাটুকু 'পারমিট' করে। প্রতিমাসে এই টাকা ক'টা বাঁচালে সংসারের কি কি উপকার হতে পারে—আগে তার হিসাব করত। এখন করে না। সমুদ্রে যে শয়ন করেছে শিশিরে তার কি ভয়-গোছের একটা নির্লিপ্ততা সীতেশকে এখন মরিয়া করেছে।

পাঁচ মিনিটও পার হয়, কৃষ্ণা আসে না। সীতেশ হাঁ করে বাস দেখে, ট্রাম দেখে। এমন কি, দেরী হয়ে গেছে বলে এলেও-আসতে-পারে ভেবে অবিশ্বাসী দৃষ্টিপাতে ট্যাক্সিও দেখে। কৃষ্ণার মতোই শাড়ী-পরা পাতলা গড়নের কাউকে দেখে 'যাক এসে গেছে' ভেবে খুশি হতে গিয়ে পচাবাদাম মুখে পড়ার বিস্বাদে রাগান্বিত হয়ে ওঠে। তারপর আরও সময় পার হলে, ভেতরে ভেতরে চাপা রাগে অস্থির হয়ে ভাবতে বাধ্য হয়, মেয়েদের সঙ্গে কখনো কোনো প্রোগ্রাম করা উচিত না। ওরা কথা রাখতে পারে না। পুরুষের গুছিয়ে তোলা কাজকে আগোছালো করাই ওদের চিরকালের স্বভাব!

ভেতরে মূল ছবিটাও শুরু হয়ে গেছে। বাইরে হাউস-ফুল টাঙানো। জমজমাট বই। এপাশে ওপাশে চড়া দামে টিকিট বেচাকেনা চলছে। সীতেশ ইচ্ছে করলে বাড়তি দামে ঝেড়ে দিতে পারে। একটু যা চক্ষুলজ্জা—কাটিয়ে উঠতে পারলে তিন টাকায় কম-সে-কম আড়াই টাকা মুনাফা। দেবে না-কি! অপেক্ষা করে লাভ নেই। এরপর কেউ হাফ্ দামেও কিনবে না। শেষ বাসটা দেখে হতাশ হয়ে প্যান্টের চোরাপকেট থেকে টিকিটদুটো বের করে সীতেশ। তারপর সত্যি সত্যি 'ব্ল্যাক' করে বসে—এই ভয়ে ঝাঁপিয়ে-পড়া মানুষের ভিড় ঠেলে রাস্তায় নেমে সামনে যাকে পায় তার হাতে গুঁজে দিয়ে টাকা তিনটে নিয়ে ময়দানের দিকে হাঁটতে শুরু করে। একটা ক্ষিপ্ত বিষণ্ণতা সীতেশের পায়ে পায়ে জড়িয়ে থাকে। ওকে খুব উত্তেজিত দেখায়।

কি হয়েছে কৃষ্ণার! কেন এল না! কাল বিকেলেই তো একসঙ্গে টিকিট কাটা হয়েছে। অসুস্থ হয়ে পড়ল? উঁহু, মধ্যবিত্ত ঘরের স্কুল-মাস্টারনী মেয়েদের শরীর এত ঠুনকো না, কথায় কথায় অসুখ হয় না। অন্তত হওয়া উচিত না। তাহলে? মাসীমা? হতে পারে! ভদ্রমহিলা যদিও কৃষ্ণার মা এবং সীতেশের ভাবী শাশুড়ী, এককালে প্রায় পুত্রবৎ স্নেহ করতেন, এখন দেখলেই কেমন বিরক্ত রুষ্ট হয়ে ওঠেন। কৃষ্ণার সঙ্গে সীতেশের মেলামেশা তাঁর একেবারেই পছন্দ না। একদিন সীতেশকে জিজ্ঞেসও করেছিলেন, 'তোমরা বিয়েটা কি এখুনি সেরে ফেলতে চাও?'

সীতেশ যেন লজ্জিত, একটু রাগতও, রূঢ় গলায় জবাব দিয়েছিল, 'হ্যাঁ, মন্দ কি।'

মাসীমার একদা-ফর্সা অধুনা তামাটে মুখ বিশ্রী রকমের কুঁচকে উঠেছিল, 'ঠিক হবে না! তোমার দুটো বোন আছে। একজন বিয়ের যুগ্যি…'

'জানি।'

'তার বিয়ে না দিয়ে…'

'ছেলে খুঁজছি।'

'অ।'

মাসীমা চুপচাপ। খুঁটিয়ে সীতেশের মুখ দেখছেন। সীতেশ বিরক্ত, অপমানিতও। পাশের ঘরে কৃষ্ণা শাড়ী পাল্টাচ্ছে। দুজনে কলেজ ষ্ট্রীটের ফুটপাতে ঘুরবে। মণ্টু এবার ইলেভেনে উঠেছে। তার জন্য কিছু পুরনো বই যদি পাওয়া যায়। তারপর কফি খাবে। কৃষ্ণা না-কি কোনোদিন কফি-হাউসে যায়নি।

একটু পরে মাসীমা ধরা গলায় বললেন, 'সীতু, কৃষ্ণার বাবা বেঁচে থাকলে ভাবতাম না। এখন আমার সংসারের যা অবস্থা, মণ্টুর একটা চাকরি-বাকরি না হলে…'

সীতেশ বেশ ঝাঁঝালো করেই বলতে চাইল, 'সংসার যেমন চলছে, চলবে। আমি এমন কিছু স্বার্থপর নই—' কিন্তু মাসীমার গভীর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখের দিকে তাকিয়ে থমকে গেল। বড় অসহায় আর করুণ মনে হ'ল তাঁকে। তার আবাল্য পরিচিতি মাসীমা! একদিন প্রতিবেশী হয়ে তাদের পাড়াতেই ছিলেন। সীতেশকে কত ভালবাসতেন। কত উৎপাত সহ্য করতেন। ক'দিন না দেখলে চলে আসতেন মা'র কাছে। পেছনে ফ্রক-পরা কৃষ্ণা। সীতেশকে ডেকে বলতেন, 'কি বাবা, দেখতে পাই না কেন! কোথায়

থাকিস? —সেই স্নেহ টলটলে মাসীমার মুখে এখন কি অসম্ভব কর্কশতা! সীতেশের বুকের ভেতরটা টনটন করে।

কৃষ্ণা খুব চাপা মেয়ে। কিছু না বললেও বুঝতে পারে— ওদের মেলামেশা নিয়ে মাসীমা আজকাল রাগারাগি করেন, ঝগড়াঝাঁটিও। কোনো কোনো দিন কৃষ্ণার মুখচোখ অস্বাভাবিক থমথমে হয়ে থাকে। সীতেশ আগ্ বাড়িয়ে কিছু বলে না। নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকে। ওর টান করে বেণী বাঁধা চুলের মাঝখানে বড় সাদা সিঁথিটায় বিকেলের পড়ন্ত রোদ্দুর চিকচিক করে। কপালে, চিবুকের পাশে ঘাম জমে থাকে। হাঁটুর উপর হাত ভাঁজ করে গালের একপাশ নামিয়ে দিয়ে একসময় কৃষ্ণা নিজেই শুরু করে, 'স্কুলের ডি-এ. টা আজও এল না!'

সীতেশ বলে, 'কাগজে দেখলাম, এ মাসেই তোমাদের বাকি-বকেয়া মিটিয়ে দেওয়া হবে।'

'ছাই হবে। অমন বহুবার বলা হয়েছে!'

'কিন্তু তোমার মন-মেজাজ ওরই জন্য খারাপ না।' চাপা হেসে সীতেশ ব্যাপারটাকে হাল্কা করে দিতে চায়, 'নিশ্চয়ই কাল রাত করে বাড়ি ফেরার জন্য কিছু হয়েছে।'

'কি আবার হবে!' কৃষ্ণা অকারণেই রুক্ষ হয়। মাথা তুলে সোজাসুজি তাকায়, 'তুমি কি করে জানলে?'

'মুখ দেখে অনুমান করছি।'

'হুঁ!' কৃষ্ণা ভুরু কুঁচকে ঠোঁট বাঁকিয়ে কেমন একটা ভঙ্গি করে। সীতেশ চা ডাকে। ভ্রাম্যমাণ ভাঁড়ের চা। আদার গন্ধ ওঠে। চা হাতে নিয়ে কৃষ্ণা সেই পুরনো কথার পুনরাবৃত্তি করে, 'ধুৎ, আর ভালো লাগে না।' সীতেশ বলে, 'কি ভালো লাগে না?' ক্লান্তভাবে জবাব দেয় কৃষ্ণা, 'এই জীবন।' সীতেশ শব্দ করে হেসে ওঠে, 'আমার কিন্তু ভা-রি ভালো লাগে!' কৃষ্ণা জবাব দেয় না, প্রখর দৃষ্টিতে সীতেশের হাসিটা লক্ষ্য করে। সীতেশ বলতে থাকে, 'সার্কাসে দেখোনি? একটা সরু তারের ওপর দিয়ে ছাতা হাতে মেয়েরা কেমন সন্তর্পণে হেঁটে ওপারে পৌঁছে যায়? . আমাদের বাঁচাটাও তেমনি, রকমারি সমস্যার সরু তারের ওপর দিয়ে হাঁটা-চলা, বেড়ে-ওঠা। আর ওই রঙচঙে ছাতাটা আমাদের ভালোবাসা, জীবনের ব্যালান্স রাখে!'

তবু কিছু বলে না কৃষ্ণা। চোখের পাতা টান করে বিমর্ষ ভঙ্গিতে চেয়ে থাকে। মাসীমার সঙ্গে রাগারাগি হলে ক'দিন কৃষ্ণা এইরকমই গম্ভীর আর

বিষণ্ণ হয়ে থাকে। এদিকটায় তেমন আসতে চায় না। স্কুলে ফোন করলেও দু'এক মিনিট কথা বলেই ছেড়ে দেয়। অগত্যা সীতেশকেই যেতে হয় টালিগঞ্জে।

আজও সিনেমা দেখতে আসার মুখে সে রকম কিছু ঘটেছে কি-না সীতেশ ভাবতে চায়। কিন্তু এখুনি টালিগঞ্জে ছুটে যাওয়ার কথা সে চিন্তা করে না। কৃষ্ণা কি কৈফিয়ৎ দেয় সেটা জানা দরকার। দোষটা যখন তারই তখন অনুতাপ-টনুতাপ তারই হওয়া উচিত! সীতেশ কেন পৌরুষ খুইয়ে ছুটে যাবে আগে? ঘাড় শক্ত করে সে একটা ট্রামের দিকে এগুতে থাকে।

পরের দিন অফিসে সীতেশের নামে ফোন আসে। রিসিভার তুলেই বুঝতে পারে, কৃষ্ণা। খুব ঠাণ্ডা নিরুত্তাপ গলায় বলে, 'শুনছি, বল।'

কৃষ্ণা বলে, 'খুব রেগে গেছ মনে হচ্ছে?'

সীতেশ পাল্টা প্রশ্ন করে, 'কেন? রাগব কেন?'

কৃষ্ণা বলে, 'ওরে বাবা! সত্যি রেগেছ! কিন্তু কি করে যেতাম বল ত? পাড়া জুড়ে যা কাণ্ড...'

'কি কাণ্ড?'

'কি না? বোমাবাজি, খুনোখুনি, পুলিশ—, সকালে কাগজে দেখনি?'

'না ত।'

'আছে। মাঝের পাতায়—'

এবার সীতেশের কণ্ঠ স্বাভাবিক হয়ে আসে। মুখের রাগ-রাগ ভাবটা মুছে গিয়ে দুশ্চিন্তা ফোটে, 'কি ব্যাপার বল ত?'

ওপাশ থেকে জবাব আসে, 'ফোনে কি সব বলা যায়? ট্রাম-বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল—'

সীতেশ প্রতিবাদ করে, 'কে বলল? আমি চার নম্বর ছয় নম্বর আসতে দেখেছি!'

'রাসবিহারী থেকে ঘুরে যাচ্ছিল। আমাদের এদিকটায় বন্ধ—'

'ও।'

'দিনটা ভালো যাচ্ছে। রাতে আবার শুরু হবে। আমি স্কুল থেকে বাসায় ফিরে যাচ্ছি।'

'তার মানে, আজও দেখা হচ্ছে না!'

'উঁহু, কাল কিংবা পরশু।'

কৃষ্ণা ফোন নামিয়ে রাখে। সীতেশ কেমন মনমরা হয়ে নিজের জায়গায়

এসে বসে। বিনয় মহান্তী অফিসে কাগজ আনে। তার কাছ থেকে নিয়ে মাঝের পাতাটা খোঁজাখুঁজি করে। কৃষ্ণা মিথ্যে বলেনি। ছোট করে আছে খবরটা। টালিগঞ্জে কৃষ্ণাদের পাড়ায় তিন ঘণ্টা ধরে বোমাবাজি, একজন ব্যবসায়ী খুন, দু'জন যুবক ছুরিকাহত, বাসে আগুন লাগানোর চেষ্টা, পুলিশের গুলি—

সীতেশ বিরক্ত হয়ে কাগজ বন্ধ করে। এসব এখন হামেশাই হয়। হয়ে হয়ে ধার নষ্ট হয়ে গেছে। কাগজওলারাও ঠেলে দিয়েছে মাঝের পাতায়। পড়ে অনুভূতি আর নাড়া খায় না। বরং সীতেশ রাগ করে এই ভেবে যে এসব খুনোখুনির পাল্লায় পড়ে শহরের ট্রামবাস প্রায়ই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, একটা প্রোগ্রামও ঠিক রাখা যাচ্ছে না! কাল সিনেমার টিকিট দুটো বিক্রি করে দিতে হ'ল। আজ কৃষ্ণা আসতে পারবে না—

অফিস ছুটির পর কি মনে হয় সীতেশ ছয় নম্বরে চেপে বসে। তারপর টালিগঞ্জ মসজিদটার কাছে নেমে একটা পুরনো বাড়ির প্রায়ান্ধকার সিঁড়ি ভাঙতে থাকে। তিনতলায় উঠে আসার পর মাসীমার মুখোমুখি।

তিনি নিস্পৃহ কণ্ঠে বলেন, 'এস বাবা, অনেকদিন দেখিনি যে?'

'এদিকে আসা হয়নি। আপনি কেমন আছেন?'

গলা শুনে কৃষ্ণা বেরিয়ে আসে। অনেকক্ষণ আগেই স্কুল থেকে ফিরেছে। গা-হাত-পা ধুয়ে সম্ভবত ঘর সংসারের কিছু কাজ সারছিল। সীতেশকে দেখে গম্ভীর হয়ে যায়, 'তুমি কি করতে এলে?'

'কেন? এসে কি দোষ করলাম!' সীতেশ হাসার চেষ্টা করে। কৃষ্ণা আরো গম্ভীর হয়, 'আচ্ছা তো! ফোনে বললাম না, গোলমাল হতে পারে—'

'এখুনি চলে যাব।'

'তোমার আসাই উচিত হয়নি।' কৃষ্ণা রীতিমতো ধমকে ওঠে। সীতেশ গ্রাহ্য করে না। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলে, 'মণ্টুকে দেখছি না?'

'বন্ধুর বাড়ি চলে গেছে। দু'তিন দিন থাকবে।'

'কেন?'

'পাড়ায় খুব ধরপাকড় চলছে। মণ্টুর বন্ধুরাও অনেকে পাড়া ছেড়ে গেছে। রাজনীতি করে বলে পুলিশের খাতায় ওর নাম আছে...'

'তাই না-কি!' সীতেশ অবাক হয়। এ খবর তার জানা ছিল না। কৃষ্ণা আর কিছু বলে না। সীতেশ লক্ষ্য করে ওর পাতলা শরীরটা একটু নুয়ে পড়েছে। মেঝে থেকে কি যেন কুড়িয়ে তুলছে। একটা সেফটিপিন। বুকের কাছ

থেকে শাড়ীটা সামান্য সরে গেছে। এক পলক তাকিয়ে সীতেশ মুখ ঘুরিয়ে নেয়। ভাঙা সেফটিপিনটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে কৃষ্ণা জানালা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে দেয়। তারপর সুইচ টিপে আলো জ্বেলে বলে, 'চা খাবে?'

সীতেশ ঘাড় নাড়ে, 'ইচ্ছে তো করছে।'

কৃষ্ণা ভুরু কুঁচকে বলে. 'ঢঙ্! সোজাসুজি বলছ না কেন?'

কৃষ্ণা চলে গেলে একা-ঘরে সীতেশ সবকিছু খুঁটিয়ে দেখে। অনেকদিন এ বাড়িতে আসেনি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু পরিবর্তন ঘটেছে কিনা লক্ষ্য করে। তারপর জানালার কাছে এসে দাঁড়ায়। নীচে রাস্তার মোড়ে একটা ট্যাক্সি হর্ণ দিচ্ছে। তার পেছনে একটা প্রাইভেট বাস। লোকজন একটু যেন ত্রস্ত, এপাশে ওপাশে ছুটোছুটি করছে। গোলমাল কি শুরু হয়ে গেল? চা-টা খেয়েই বেরিয়ে পড়বে সীতেশ—

একটু পরেই কৃষ্ণা চা নিয়ে আসে। আর ঠিক তখুনি, সন্ধ্যার মুখে মুখে, অল্প দূর থেকে ঘন ঘন বোমা ফাটার আওয়াজ আসতে থাকে। রাস্তার বাতি-গুলো সহসা নিভে যায়। ধাবমান ব্যস্ততার সঙ্গে চাপা কোলাহল শোনা যেতে থাকে। সীতেশ জানালার কাছে এসে দাঁড়ায়। দুশ্চিন্তায় মুখ কালো করে কৃষ্ণা বলে, 'দেখলে তো, শুরু হয়ে গেল! এখন যাবে কি করে?'

সীতেশ বলে, 'ঠিক চলে যাব। ও-সব অভ্যেস হয়ে গেছে!'

কৃষ্ণা জানালা দিয়ে উঁকি দেয়, 'রাস্তাঘাট যে অন্ধকার।'

'হ্যাঁ।'

'ট্রামবাস বন্ধ হয়ে গেছে বোধহয়।'

'হতে পারে।'

'তাহলে?'

'খানিকটা হাঁটতে হবে।'

'ধুৎ, ইয়ার্কি ভালো লাগে না!' কৃষ্ণা সত্যি সত্যি রেগে যায়, 'কে আসতে বলেছিল তোমাকে? কেন এলে?'

সীতেশ উত্তর দেয় না। কৃষ্ণার ক্রুদ্ধ উত্তেজিত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার জন্য কৃষ্ণার এমন গভীর দুশ্চিন্তা সীতেশের ভালো লাগে। যেন অনেক-দিন পরে ভালোবাসার একটা গাঢ় জীবন্ত রঙ কৃষ্ণার চোখে-মুখে টলটল করতে দেখে সীতেশ। তার বুকটা হঠাৎই ফুলে ফেঁপে দুরন্ত সাহসী হয়ে ওঠে।

'তুমি কিছু ভেবো না কৃষ্ণা! গলিঘুঁজি দিয়ে বেরিয়ে যাব!'

বলতে বলতে সিঁড়ির দিকে এগোয় সীতেশ। আর তৎক্ষণাৎ খুব কাছাকাছি

বিশাল শব্দে একটা ক্র্যাকার ফাটে। তারপরই অনবরত ডুম্-ডুম্ শব্দ। কৃষ্ণা কেঁপে উঠে বলে, 'না সীতেশ, তুমি যেও না। ফায়ারিং হচ্ছে।'

মাসীমাও এগিয়ে আসেন, 'বসে যাও বাবা। একটু দেখে যাও—'

এ-বাড়ির প্রতিবেশীরা ছুটে এসে যে-যার ঘরে খিল দিতে শুরু করে। তাদের মুখ থেকেই শোনা যায়, ব্রিজের কাছে একটু আগেই একজন পুলিস খুন হয়েছে। থানার উপরেও কারা বোমা ছুঁড়েছে। মিলিটারি চারদিক থেকে ঘিরে ফেলছে। তারা মাইকে কার্ফু জারি করে দিয়েছে। এবার বাড়ি বাড়ি ঢুকে সার্চ হবে। সার বেঁধে পুলিশের গাড়ি এগিয়ে আসছে—

সীতেশ আবার ঘরে ফিরে আসে। কৃষ্ণা জানালাটা বন্ধ করে দেয়। মাসীমা খুব ভয় পেয়ে বলেন, 'হ্যাঁ বাবা, আমাদের ঘরও সার্চ হবে?'

সীতেশ বলে, 'হতে পারে, বিচিত্র কি!'

মাসীমার মুখ আরো সাদা হয়, 'তুমি যেও না। আজ এখানেই থাক।'

কৃষ্ণা বলে, 'যাবে কি করে! বাইরে কার্ফু, দেখলেই গুলি…'

সীতেশকেও চিন্তিত দেখায়, 'হ্যাঁ, মনে হচ্ছে এখানেই রাত্রিবাস!'

কথাটা যথেষ্ট হাল্কাভাবেই বলার চেষ্টা করে, কিন্তু ভেতরে অসম্ভব অস্বস্তি ঘুরপাক খায়। সত্যি রাত্রিবাস? এখানে? এই কৃষ্ণাদের বাড়িতে? কখনো এ বাড়িতে থাকেনি সে। থাকা যায় না। মাসীমা কি ভাববেন? অন্য ভাড়াটেরা কি ভাববে! তাছাড়া নিজের বাড়িতে মা-ভাই-বোনেরা সারারাত ধরে চিন্তা করবে। পাড়ায় একটা ফোন করতে পারলে হয়।

'তোমাদের এই বাড়িতে কারো ফোন আছে?'

কৃষ্ণা ঘাড় নাড়ে, 'নেই। রাস্তায় নামতে হবে—'

'রাস্তায়?'

সীতেশকে ভারি বিচলিত দেখায়। কৃষ্ণাকে বিব্রত। মাসীমা বিবর্ণ মুখে একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন।

……একটু একটু করে রাত বাড়তে থাকে। বাইরে ঘন অন্ধকারে তীব্র সার্চ-লাইট জ্বালিয়ে পুলিশের গাড়ি ছুটোছুটি করে। এরিয়ালের সরু ফলা সাপের জিভের মতো লকলক করে। কিছুক্ষণ নিঃশব্দ থাকার পর আবার কোথাও বোমা ফাটে। পুলিশের রাইফেল গর্জে ওঠে। দলবদ্ধ ছুটন্ত বুটজুতার বিকট শব্দে ভাঙাবাড়ির ডেরা থেকে কবুতরেরা উড়ে পালায়, ও-পাশের গোয়াল থেকে গরুগুলো ডাকতে থাকে।

অগত্যা কৃষ্ণাদের বাড়িতেই রাত্রিবাসের জন্য প্রস্তুত হতে হয় সীতেশকে।

নানারকম ভাবনা আতঙ্কের মধ্যেও মাসীমা রান্না করেন। সীতেশকে খেতে হয়। যতটা সম্ভব যত্ন করেই খাওয়ান মাসীমা। এখন সীতেশকে তাঁর অপ্রয়োজনীয় অবান্তর মনে হয় না। বরং বাড়ি সার্চ হওয়ার আসন্ন সম্ভাবনার মধ্যে সীতেশ নামক পুরুষটিকে তাঁর একটা অবলম্বন বলেই মনে হয়।

মণ্টুর বিছানায় শোবার ব্যবস্থা হয়। লজ্জিত সঙ্কুচিত সীতেশ গায়ের জামা খুলতে খুলতে বলে, 'কি ফ্যাসাদ যে হ'ল আজ।'

কৃষ্ণা জবাব দেয়, 'কেন ? জলে তো পড়নি !'

'না, মানে—'

'চুপচাপ শুয়ে থাক। আমরা খেতে যাচ্ছি—'

'এক গ্লাস জল—'

'দিয়ে যাব।'

আরো অনেকক্ষণ পরে কৃষ্ণা টেবিলে জল রাখতে আসে। সীতেশ তখনও শোয়নি। মণ্টুর একটা বই নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। বাইরের পৃথিবী এখন নিঝুম। এখানে-ওখানে অলিতে-গলিতে খণ্ডযুদ্ধের পর এখন যেন অখণ্ড নিঃশব্দতা বিরাজ করছে। এমন কি পুলিশের গাড়ির শব্দও পাওয়া যাচ্ছে না। হঠাৎ এত বেশী নীরবতাও কেমন ভয়ঙ্কর ঠেকছে। কৃষ্ণার দিকে তাকিয়ে সীতেশ বলে, 'মনে হয়, পুলিশী অপারেশন শেষ হয়েছে।'

কৃষ্ণা একটা খাতা তুলে গ্লাসটা ঢাকা দেয়, 'হ্যাঁ, সাড়াশব্দ তো পাচ্ছি না।'

সীতেশ বলে, 'তুমি কিন্তু দারুণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলে।'

কৃষ্ণা ঠোঁট ওল্টায়, 'তুমি পাওনি ?'

'আমি ?'

সীতেশ সহজ হয়ে হাসতে চায়। উঠে এসে রাস্তার দিকের জানালাটা খুলে দেয়। অন্ধকারে কিছু দেখার চেষ্টা করে। আকাশে মেঘের ফাঁকে চাঁদের মুখ দেখা যায়। সরু ঘোলাটে চাঁদ, আলো নেই। আকাশটা অদ্ভুত দেখায়। ঠাণ্ডা বাতাস জলকণা বয়ে আনে। সীতেশের কেমন শীত-শীত করে। সে ঘুরে দাঁড়াতেই টের পায়, কৃষ্ণাও তার পাশে দাঁড়িয়ে রাস্তা দেখার চেষ্টা করছে। সীতেশের পিঠের কাছে তার শরীরের এক অংশ, মাথার চুল থেকে নারকেল তেলের গন্ধ আসছে, ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস পতনের শব্দ। সীতেশ কৃষ্ণার চোখে চোখ রাখে, 'আজকের রাতটা বড় অদ্ভুত! অনেকদিন মনে থাকবে।'

কৃষ্ণা জবাব দেয় না। আঙুলের ডগায় চুল জড়িয়ে-জড়িয়ে অল্প-অল্প

হাসে। কেমন ভয়-ভয় বিবর্ণ হাসি। তবু ওর শীর্ণ শ্যামল মুখ এই গভীর রাতে অনেক বেশী নরম, সুন্দর দেখায়। গালের ভাঁজে ভাঁজে বয়সের রেখা চোখেই পড়ে না। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সীতেশ সহসা কৃষ্ণার একখানা হাত ধরে। চাপাগলায় জিজ্ঞেস করে, 'মাসীমা শুয়ে পড়েছেন ?'

কৃষ্ণা ঘাড় কাৎ করে। হাত ছাড়িয়ে নেয় না। অল্প অল্প হাসিটুকু আরো প্রসারিত করে বলে, 'তুমিও শুয়ে পড।'

এবার কৃষ্ণা হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে। ওর চোখের পাতা নত হয়, গালে ও চিবুকে লজ্জার ছাপ পড়ে। মুখটা সামান্য গম্ভীর দেখায়। সীতেশ রক্তের মধ্যে কেমন উত্তেজনা অনুভব করে। একটু আগে অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে যে সমস্ত আবেগ-অনুভূতি জাঁতাকলে ইঁদুরের মতো ভয়ে আতঙ্কে দমবন্ধ হয়ে ছিল—এখন বাইরের আকাশে-বাতাসে শান্তি ফিরে আসায় তারা যেন অস্থির ছটফটে হয়ে মুক্তি চায়। সীতেশ আরো কাছাকাছি সরে আসে। কৃষ্ণার চোখে এক ধরনের উজ্জ্বল তীব্রতা দেখা দেয়। নিঃশ্বাসের শব্দ গাঢ় হয়। চিবুকেব নীচের অংশ কাঁপতে থাকে। বিশ্লিষ্ট ঠোঁটের ফাঁকে সাদা দাঁত চিক চিক করে। সে আস্তে আস্তে মুখ তুলে সীতেশের দিকে তাকায়। সীতেশ কিছু বলে না। আস্তে আস্তে মুখ নামিয়ে আনে। একটি ওষ্ঠাধর আরেকটি ওষ্ঠাধরের কাছে এসে পৌছায়......

এমনসময় সহসা অন্ধকার কাঁপিয়ে রাইফেল গর্জে ওঠে—সঙ্গে সঙ্গে আকুল তীব্র চিৎকার! শব্দটা এত কাছে এমন প্রবল হয়ে বাজে যে মনে হয় জানালার কাছেই কোথাও গুলি এসে ঠিকরে পড়ল।

দুজনেই থরথর করে কেঁপে ওঠে। কৃষ্ণা ভয়ে ছিটকে সরে যায়। সীতেশ ভয়ে ভয়ে তাকায় জানালা দিয়ে। হাত বাড়িয়ে বন্ধ করার সাহস হয় না। সার্চ লাইটের প্রখর আলো ফেলে একটা পুলিশের গাড়িকে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। আরো একটা ছুটে আসার শব্দ শোনে।

বিবর্ণ মুখে কৃষ্ণাও পাশে এসে উঁকি দেয়।

রাত্রির নৈঃশব্দ চিরে আবার কোথাও পর পর বোমা ফাটে। রাইফেলও গর্জে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে। ভূমিকম্পের মত ঘরদরজা কেঁপে যায়। একটুপরেই আবার সব কঠিন নিথব। মৃত্যুর মত হিমশীতল স্তব্ধতা আকাশে ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশের গাড়ির আলো বাঘের চোখের মত জ্বলতে থাকে। মনে হয় একটা যুদ্ধের শেষে আর একটা শুরুর জন্য দু'পক্ষই রুদ্ধ নিঃশ্বাসে ওৎ পেতে আছে।

কৃষ্ণা চাপা আতঙ্কে বলে, 'জানালা বন্ধ কব শীগ গিব—'

সীতেশ অস্ফুটে আর্তনাদ করে ওঠে, 'ওই দেখ—'

সার্চ লাইটের তীব্র আলোয় স্পষ্ট দেখা যায়, বুট জুতোর শব্দ তুলে ক'জন পুলিশ ছুটে আসছে। হাতে উদ্যত রাইফেল, মুখে-চোখে জান্তব উল্লাস; যেন এতক্ষণে ফাঁদ পেতে একটা শিকার ধরতে পেরেছে ওরা। তাদের দুজন একটি তরতাজা যুবকের দেহ দু'পা ধরে উঁচিয়ে রাস্তা দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে আসছে। অরণ্যের হিংস্র প্রাণী অনেক চেষ্টায় ধাবমান কোনো হরিণ নিহত করে ঘাড়ে-গলায় দাঁত বসিয়ে টেনে হিঁচড়ে যেমন নিজের ডেরায় নিয়ে যায়—ঠিক তেমনি। যুবকটির মুখ থেৎলে গেছে, চোখ দুটো বিস্ফারিত, সারা শরীর রক্তে মাখামাখি। ঘন কালো চুলে ঢাকা মাথাটা শক্ত পীচের রাস্তায় রক্তের ছাপ ফেলে ঘষা খেতে খেতে আসছে। গাড়ির কাছে এনে খোলা দরজা দিয়ে পাটাতনের উপর সশব্দে ছুঁড়ে দিল দেহটা। সম্ভবত ছেলেটা তখনও বেঁচেছিল, কেননা শেষবারের মত একটা তীব্র ক্রুদ্ধ গোঙানি যেন শোনা গেল—

সেই ভয়ঙ্কর বীভৎস দৃশ্য দেখা মাত্র দু'হাতে মুখ ঢেকে কৃষ্ণা আর্তনাদ করে উঠল।

সীতেশ কাঁপা হাতে টান দিয়ে জানালা বন্ধ করে দিল।

তারপর সারারাত্রি ওরা কেউ কোনো কথা বলল না। সারারাত্রি পরস্পরের দিকে একবার তাকাল না পর্যন্ত। ঠাণ্ডা নীল পাংশু মুখে শক্ত কঠিন শরীর নিয়ে এই দুই যুবক-যুবতী ভাঙাচোরা বাড়িটার তিনতলার অন্ধকার ঘরে সারারাত্রি তন্দ্রাহীন নির্ঘুম চোখে নিঃশব্দে বসে থেকে সূর্যোদয়ের প্রতীক্ষা করতে লাগল।

সময়, আমার সময়

জঙ্গলে শিকারী কুকুরের তাড়া খেয়ে সজারু যেমন ত্রস্ত অথচ রাগত ভঙ্গিতে সর্বাঙ্গে কাঁটা উঁচিয়ে দ্রুতবেগে ছুটতে থাকে—শিবেনও তেমনি ওভারব্রীজের সিঁড়ি ভেঙ্গে ছুটছিল। ও-পাশে নটা-পঞ্চাশ দাঁড়িয়ে আছে, ফসকে গেলেই চল্লিশ মিনিট লেট্। ভাদ্রমাসের জলন্ত সূর্যশিখা শরীরে প্রতিফলিত হয়ে তাকে উত্তপ্ত করে তুলছিল এবং দ্রুত ছোটার ফলে বাতাসের ঘর্ষণে তাপ দ্বিগুণ হওয়ায় সমস্ত লোমকূপে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছিল, এমন কি চুলের গোড়া থেকেও ঘামের ফোঁটা ভুরু ও গাল বেয়ে টপ টপ করে বুকের উপর ঝরে পড়ছিল।······আর সময় নেই! এক মিনিট দূরে থাক, দশ সেকেণ্ড সময়ও নেই। এর মধ্যে গোটা শরীরটা না পারুক কিছু অংশ অন্তত তুলে দিতেই হবে কোনোএকটা কামরায়···

একজন মাঝবয়সি মহিলাকে ধাক্কা দিল, একটি যুবকের পা মাড়িয়ে খিস্তি শুনল, সিঁড়িতে হোঁচট খেয়ে টাল সামলাতে একজন দেহাতি মানুষের কাঁধ খামচে ধরল, তারপর প্ল্যাটফর্মে নেমে 'দেশ দ্রুত সমৃদ্ধির পথে'-পোস্টারের তলায় বসে-থাকা অপুষ্ট খোঁড়া-পা উলঙ্গ শিশুটার ভিক্ষাপ্রার্থী টিনের বাটিটা লাথি মেরে ছিটকে ফেলল। ইতিমধ্যে ইলেকট্রিক ট্রেন হর্ণ বাজিয়ে দিতেই পশ্চাতের কোনো স্মৃতির প্রতি তিলমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে একটা দরজার উপর সবেগে লাফিয়ে পড়ল। আর তৎক্ষণাৎ ট্রেনটাও ছেড়ে দিল।

ঠাসাঠাসি ভিড়ে শরীরটা এভাবে ছুঁড়ে দেওয়ায় জমাট ভিমরুলের চাকে ঢিল পড়ার অবস্থা হয়েছিল। এখন চারদিক থেকে কটু মন্তব্যের বিষাক্ত হুল ঝাঁক বেঁধে ছুটে আসছে। বিব্রত বিপর্যস্ত শিবেন নিরুত্তর, হাঁ করে শ্বাস টানছে, চোখে-মুখে কাতর ক্ষমা-প্রার্থনার ভঙ্গি।

অথচ সারা শরীরে উত্তেজনা সজারুর কাঁটার মতো মাথা উঁচিয়ে আছে। মনটা খাঁচাবন্দী বাঘের মতো গর্ গর্ করছে। রাগটা কেন এবং কার উপর স্পষ্ট বুঝতে পারছে না বলে অস্থিরতা আরো বেশি সঞ্চারিত। ট্রেনটা আজ নিখুঁত

নির্ভুল সময়ে এসে দু'এক সেকেণ্ড আগেই ছেড়ে গেছে বলে রাগটা কি তার উপর, অথবা বাসা থেকে বেরুনোর সময় আ-কাচা রুমাল নিয়ে কুৎসিত কথা কাটাকাটিতে ক'মুহূর্ত সময় নষ্ট করতে হয়েছে বলে সুধানাম্নী তার মুখরা স্ত্রীর উপর, কিংবা এই পচাভ্যাপসা গরম ঘাম রৌদ্রতাপ, স্টেশনের মুখে মরাকুকুরের আঁশটে গন্ধ, ওভারব্রীজে ধাক্কাধাক্কি, পা-মাড়িয়ে-দেওয়া-মস্তান-ছোকরার অশ্লীল গালিগালাজ এবং সবশেষে ঠাসাঠাসি ভিড়ের মধ্যে ঝুঁকি নিয়ে শরীরটা হঠাৎ ছুঁড়ে দেওয়া……এইসব একসঙ্গে মিলেমিশে তাকে এত বেশি তাতিয়ে তুলেছে !

……এখন ক্রমশ আরো ক্রুদ্ধ, কেননা ভিড়ের মানুষগুলো এমন স্বার্থপর, অসহিষ্ণু ও অমানবিক যে তার প্রতি অণুমাত্র সহানুভূতি বা সমবেদনার পরিবর্তে ইতরের মতো ক্রমাগত হুল ফুটিয়ে যাচ্ছে অথচ নড়ে-চড়ে আধ-ইঞ্চি জায়গাও দিচ্ছে না যাতে শূন্যে ঝুলন্ত ডান-পাটা কোথাও রেখে একটু সোজা দাঁড়িয়ে স্বচ্ছন্দে শ্বাস টানতে পারে। সে নিরুপায় নির্বাক, কারো কথার জবাব দেবার সাহসটুকুও সঞ্চয় করতে পারছে না। ছুটে আসার জন্য এখনও একরকম জিভ বের করে কুকুরের মতো হাঁফাচ্ছে……

অনর্গল নিক্ষিপ্ত তিক্ত কটু মন্তব্য থেকে তাকে বুঝতে হচ্ছে, দোষটা ষোলোর উপর আঠারোআনা তারই, শরীরের ভারসাম্য হারিয়ে ঠিকমতো দরজার আংটা কি লোহার রড্ ধরার পরিবর্তে তিনতিনটে মানুষের গায়ে পায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে, একজনের জামা খামচে ধরে বুঝি-বা একটা বোতামও ছিঁড়ে দিয়েছে, আর একজনের চশমা নাক থেকে কাঁধের উপর ছিটকে ফেলেছে…এই অবস্থায় আকৃতিতে মানুষ যদি বা হয়ে থাকে প্রকৃতিতে বন-মানুষ, কাণ্ডজ্ঞান বলতে নেই, গাড়িতে খড-তুলোর বস্তা কি শুয়োরমুর্গী যাচ্ছে না যে ইচ্ছে হলেই ঠেসেগুঁতিয়ে আরো দু'একটা ঢুকিয়ে নেওয়া যায়, অফিসের নিত্যযাত্রী সকলেই, সকলেরই সময়মতো হাজিরার তাড়া আছে, মাথার উপর জরুরী অবস্থার খাঁড়া আছে, তাই বলে চোখেমুখে অন্ধ, বেহেড্ মাতালের মতো…

হঠাৎ মৌনতা ভেঙ্গে আরক্ত চোখে চাপাগলায় শিবেনও ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'অনেক জ্ঞান দিলেন ! এবার থামুন দাদারা ! পা-টা একটু রাখতে দিন…'

আর তখুনি উদোম ন্যাংটা ভিখিরি শিশুটার কথা তার মনে পড়ে গেল। ওর বাটিতে ক'টা পয়সা ছিল। আচমকা লাথি পড়ায় চারপাশে ছিটকে পড়েছে। নির্বোধ রক্তহীন বিকলাঙ্গ শিশু একটা কথাও বলে নি, বলার

সুযোগই পায় নি। প্রতিবাদের সাহস ও ভাষা তার জানা নেই। অথচ দেখ, এই লোকগুলোকে দেখ, ভদ্র জামাকাপড়ে কেমন অসহিষ্ণু, কুটিল, হিংস্র! অন্যের শরীরে কামড় বসানোর সামান্য সুযোগ পেলেই কেমন চমৎকার নখদাঁত বের করে। যেন চলাফেরায় জীবনযাপনে অন্যের সুখসুবিধার দিকে সবসময়ই সজাগ দৃষ্টি রাখে সবাই, যেন ভুলেও কোনোদিন চলন্ত ট্রেনে কারো ঘাড়ে পিঠে হুমড়ি খেয়ে পড়ে না, কারো জামার পকেট কি কাপড়ের কোঁচা খামচে ধরে না! ভদ্দরলোক! শালারা সব ভদ্দরলোক!

'ফেরার পথে ভিখিরি-বাচ্চাটাকে আমি আটআনা পয়সা দেব'— মনের গভীরে এরকম একটা প্রতিশ্রুতি অবিশ্বস্ত ভাবে উচ্চারণ করে আবার অস্থির রাগী-গলায় শিবেন বলে উঠল, 'ইচ্ছে করে কেউ জামার বোতাম ছেঁড়ে না। অন্যায় হয়েছে, মাপ চাইছি, এবার দয়া করে থামুন…'

ততক্ষণে ট্রেন ধাতব শব্দ তুলে হু হু করে ছুটছে। শিবেনের ঘাড়গলা বুক বেয়ে ঘাম ঝরছে। বুকের ভাঁজে ভাঁজে এখনো শ্বাসকষ্ট। পকেটে হাত ঢুকিয়ে রুমাল বের করার উপায় নেই। দরজার মুখে মানুষের ভিড় তাকে ময়দাঠাসা করে রেখেছে, নড়াচড়ার জন্য তিল পরিমাণ ফাঁকটুকুও অবশিষ্ট রাখে নি। তবু ঘামতে ঘামতে এবং ঘামের নোনাজল ঠোঁট থেকে জিভ দিয়ে চাটতে চাটতে সে বাঁ হাতটা উঁচিয়ে পকেটের দিকে আনতে চাইল। পারল না, কেন না তখুনি তার হাতঘড়িটা কারো কোমরের বেল্ট্‌-এ আটকে গিয়ে শক্ত বাধার সৃষ্টি করল। ফলে ফের গালাগালির ভয়ে সন্ত্রস্ত শিবেন হাতটা আর টানাটানি করার সাহসই পেল না। যেন হাতটা তার না, অন্য কারো, এমন নিস্পৃহ ভঙ্গি করে উটের মতো ঘাড়গলা উঁচিয়ে সে বাইরের বাতাস পাওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু কব্জিতে ঘড়িটার অস্তিত্ব সম্পর্কে সজাগ হয়ে ওঠায় সে বিকৃত বিরস মুখে তৎক্ষণাৎ নিঃশব্দ গর্জনে বলে উঠল, 'এর জন্য! এই ঘড়িটার জন্য! এই বাঞ্চোৎকে যদি না আজ…'

যেন এতক্ষণে মনের ঝাল ঝাড়ার উপযুক্ত ক্ষেত্রটি খুঁজে পেল এবং পাওয়া মাত্র তার দীর্ঘসময়সঞ্চিত রাগবোধ সাপের ফণার মতো উদ্যত করে তার উপর ক্রমাগত ছোবল মারতে লাগল।…এই শুয়োরের বাচ্চা ঘড়িটাই যত নষ্টের মূল। এই শালাই আমাকে ডোবাচ্ছে। বেইমান বিশ্বাসঘাতক এই ঘড়িটার জন্যই গত ক'মাসে আমি অন্তত চারবার ন'টা পঞ্চাশ ফেল্ করতে করতে কান ঘেঁষে বেঁচে গেছি। আজও নির্ঘাৎ এই ঘড়িটার জন্যই তাড়া-খাওয়া জন্তুর

মতো ছুটতে হয়েছে আমাকে, তারপর শরীরটা ট্রেনের কামরায় গেল কি পিছলে প্ল্যাটফর্মেই আছড়ে পড়ল, না ভেবেই অন্ধের মতো……

ট্রেচারাস ঘড়িটা এখন অসহ্য!

শিবেন দাঁতে দাঁত চাপল এবং রুষ্ট ঈর্ষান্বিত ভঙ্গিতে আশেপাশের অনেকগুলো সুন্দর সুদৃশ্য ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ঝটকা মেরে হাতটা তুলে নেবার চেষ্টা করল। যেন কব্জি থেকে ঘড়িটাকেই ঝেড়ে ফেলতে চাইল!

বস্তুত যে ঘড়ি বছরে দেড়মাস অকেজো হয়ে ঠুলি-চোখের সামনে চিৎপাৎ বে-আবরু পড়ে থাকে, আর বাকি ক'মাস কব্জিতে ঝুলেও কখনো পাঁচ কখনো সাত-আট মিনিট হামাগুড়ি দিয়ে মর্জিমাফিক পেছনে হাঁটে—তাকে যত্নে পুষে রাখার কি অর্থ হয়! রোজ রাতে নির্দিষ্ট সময় মেনে চাবি ঘুরিয়ে দম দিয়ে চালু রাখারই বা দাম কি! ঘড়ি ঘোড়া হলে যদি বা মানিয়ে নেওয়া যায় কিন্তু কচ্ছপ হলে 'স্লো বাট্ স্টেডি' মন্ত্রে বাজি জিতবে—এমন আশা কোন্ গাঁড়লে করে! কারখানা অফিসের হেড্-সুপারিন্টেনডেন্ট্ আদ্যনাথ ঘোষাল ঠিক কথাই বলেন, 'বিগ্ড়ানো ঘড়ি আর……'

ক'দিন আগেই ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বিশ্রীভাবে হেসে উঠেছিলেন ঘোষাল, 'করেছ কি শিবেন, ঘড়ির কাঁটা পিছিয়ে সময়ের সঙ্গে চালাকি করছ! এদিকে হাজ্‌রে খাতা যে আমি সেনসাহেবের ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছি!'

শিবেনের ঘড়ি সেদিন ছ'মিনিট বত্রিশ সেকেণ্ড স্লো। নির্দিষ্ট ট্রেন ফেল হয়েছে এবং অফিসে পৌঁছতে পঞ্চাশ মিনিট লেট। জরুরী অবস্থায় জারি-করা মহারাণীর হুকুমনামা মেনে সেনসাহেবের বিশ্বস্ত অনুচর ঘোষালমশাই হাজিরাখাতা তাঁর টেবিলে পৌঁছে দিয়েছেন। লাল কালিতে পাকাপাকি এবসেণ্ট্ মার্ক পড়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়। নিজের উপস্থিতি জানান দিতে হলে চোরের মতো মুখ করে এখন ওই ঘরে ঢুকতে হবে, বেঁকে দুমড়ে দাঁড়াতে হবে এমন ভঙ্গিতে যেন নিকট আত্মীয়কে চিতায় রেখে এইমাত্র শ্মশান থেকে ফিরল!

সেদিনই ঘোষালবাবু তাকে বলেছিলেন, 'নতুন একটা ঘড়ি কেনো হে শিবেন। এখন কথা কম, কাজ বেশি! তার মানে সময়ের খুব কড়াকড়ি, পান থেকে চুণ খসার উপায় নেই। পুরনো ঘড়িতে কি নতুন কালের কাজ চলবে? ও হ'ল হেঁপো রুগীর মতো, এই ভাল, এই টান উঠল, চোখ উল্টে হাঁসফাঁস অবস্থা……'

শিবেন বিব্রত ভঙ্গিতে অপরাধীর মতো বলেছিল, 'হ্যাঁ ঘোষালদা, ঘড়িটা খুব ট্রাবল দিচ্ছে। গতমাসেই বারো টাকা খরচ করে অয়েলিং করালাম……'

আগুনাথ সোনার তার জড়ানো বাঁধানো দাঁতে হাসির মতো একটা ভঙ্গি করলেন, 'উঁহু, যতই তেলজল দাও, স্বভাব পাল্টাচ্ছে না। ওহে, ঘরের বউ একবার বারমুখো হলে শাড়িগয়নায় আর কি পোষ মানে? পুরনো ঘড়ি আর অসতী বউ তুই-ই ভারি ট্রেচারাস শিবেন, পেছন থেকে ছুরি বসায়, সাবধান।' বলে নিজের রসিকতায় নিজেই মোটাসোটা দেহখানা নাচিয়ে সশব্দে হেসে উঠেছিলেন।

তাঁকে খুশি করার জন্য শিবেনেরও হাসা উচিত ছিল। কেননা এসব কারখানাসংলগ্ন সদাগরি অফিসে ঘোষালবাবুদের খুশি-অখুশির উপর জুনিয়র-স্টাফের রুটি-রোজগার প্রোমোশন-ডিমোশন নির্ভর করে। কিন্তু শিবেন হাসতে পারল না, মুখ কালো করে দাঁড়িয়ে থাকল। এই নিয়ে সে পর পর বেশ ক'দিন লেট্ হাজিরা দিল। ঘড়ির প্রসঙ্গ তুলে আগুনাথ ইঙ্গিতে শিবেনকে আজ কি একটু ধমকই দিলেন না?

কিন্তু হাসতে না পারুক, কিছু অন্তত বলা দরকার। কি বলবে? শিবেন কথা খুঁজে পাচ্ছে না। কথাবার্তায় চতুর চটপটে নয় সে। কোনো কালেই ছিল না। সুন্দর করে শ্লেষ বিদ্রূপ ঝাঁঝ মিশিয়ে কথা বলা একটা আর্ট। শিবেন তার চর্চা করে নি।

আসলে তার মনটা অন্তর্মুখী। গভীরভাবে কিছু ভাবতে পারে, সাজিয়ে গুছিয়ে লিখে ফেলতেও পারে কিন্তু বলাটলার ব্যাপার এলেই কেমন নার্ভাস হয়ে যায়! কলেজে বিতর্ক-সভায় কখনো যোগ দেয় নি কিন্তু ম্যাগাজিনে কবিতা লিখেছে। পরেও লিখেছে কিছু কিছু। একটা বই করারও কথা হয়েছিল। বইও হয় নি এবং এখন কবিতাও আর লেখে না। কচিৎ সে প্রসঙ্গ উঠলে গভীর থমথমে মুখ করে বলে, 'রাক্ষুসে সময় সব গিলে খেয়েছে।'—এই 'রাক্ষুসে সময়' বলতে সে ঠিক কি বোঝাতে চায়, তার স্ত্রীপুত্রকন্যাবেষ্টিত সংসার, সংসারের নিত্য অভাবঅনটন, অফিসের উদয়াস্ত পরিশ্রম অথবা বাইরের অস্থিরতা ও মূল্যবোধের বিপর্যয়—স্পষ্ট করে বোঝা যায় না। কথাটা বলে এমন ভয়ানক গম্ভীর হয় যে, তৎক্ষণাৎ মনে হয় তার স্মৃতির বন্ধকোঠায় একটা তোলপাড় চলছে এবং বুকের গভীরে কোনো গোপন ক্ষতস্থান থেকে রক্ত চুঁইয়ে নামছে। ফলে প্রসঙ্গটা নিয়ে কেউ আর নাড়াচাড়া করে না।

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে শিবেন আগুনাথ ঘোষালের মুখভঙ্গি

পরীক্ষা করল। হাসির অন্তরালে শাসনটুকু কি চমৎকার গোপন করে রেখেছেন! অসম্ভব ধূর্ত মানুষ!

রাগ-রাগ ভঙ্গিতে নিজের ঘড়িটাও দেখল। এখনও সাত মিনিট পেছনে হাঁটছে। কাঁটা ঘুরিয়ে ঠিক করা হয় নি।...শুধু শাসন না, ঘড়িটা নিয়ে আত্মনাথ তাকে কি ব্যঙ্গও করলেন না? কেননা হেঁপোরুগীর মত ঝরঝরে এই পুরনো ঘড়িটার মালিকানা তো তারই, সে-ই তো এটাকে অষ্টপ্রহর কব্জিতে বেঁধে জনসমাজে ঘুরে বেড়ায়। এই রংচটা নিকেল-ওঠা চৌকো-সাইজের বেঢপ বস্তুটা এ যুগের পক্ষে নিতান্ত বেমানান, প্রবহমান সময় এর কলকব্জা কুরে কুরে খেয়ে নির্ভুল সময়-গণনার শক্তি পঙ্গু করেছে......অথচ আমি এটা পাল্টাতে পারি না। পাল্টে নতুন কেনার ক্ষমতা নেই, জোড়াতালি দিয়ে এটাকেই হাতে ঝুলিয়ে বাবু-সাজার সখ মেটাচ্ছি, ইঙ্গিতে এসবও বুঝিয়ে দিয়ে আমার রুচি অক্ষমতা আর অসামর্থ্যকে বিদ্রূপ করলেন না!.... আত্মনাথের সোনালি ব্যাণ্ডের ঝকঝকে নতুন ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে এতক্ষণে শিবেন কথা খুঁজে পেল। যথেষ্ট আহত অথচ বিনীত দৃঢ় গলায় সে বলে বসল, 'না ঘোষালদা, ঘড়িটা আমার তেমন খারাপ না। বৃটিশ আমলের জিনিষ। মোস্ট ওবিডিয়েন্ট সারভেন্টের মত পঞ্চাশ বছর ধরে ফেইথফুল সার্ভিস দিয়ে আসছে। এখন তো সব বাইরে চকনাই, ভেতরে ঠুনকো...' বলেই তাড়াতাড়ি নিজেকে সংশোধন করল, 'আপনারটা অবশ্য খুব দামী। ওটার কথা আলাদা...'

আত্মনাথবাবু হাসি গুটিয়ে গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়লেন। শিবেন নিজের চেয়ারে এসে ক্রুদ্ধ অপমানিত ভঙ্গিতে হাত থেকে টান মেরে ঘড়িটা খুলে নিল। যেন এখুনি জানালা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলবে, এমন ভঙ্গি! আসলে কাঁটা ঘুরিয়ে সময় ঠিক করবে সে......

ঘড়িটার প্রতি আর মমতা নেই শিবেনের। কিন্তু একসময় ছিল। কেননা এটা তার পিতৃদত্ত জিনিষ। দরিদ্র স্কুল-শিক্ষক পিতা স্থাবর-অস্থাবর কোনো সম্পত্তি পুত্রকে দিতে পারেন নি। শিবেন যখন কলকাতার কলেজে ভর্তি হ'ল তখন শুধু ঘড়িটাই নিজের হাত থেকে খুলে শিবেনের হাতে দিয়ে বলেছিলেন, 'ছুটোছুটি করে ট্রেন ধরতে হবে, সময়মত ক্লাস করতে হবে।...তুই এটা নে। আমার আর কি দরকার!'

সদ্য যৌবনপ্রাপ্ত শিবেনের আধুনিক মন স্বভাবতই পুরনো মডেলকে সু-নজরে দেখেনি। তার অপ্রসন্নতা বাবা বুঝেছিলেন। ম্লান হেসে বলেছিলেন, 'সময়

দিতে কিন্তু গোলমাল করে না। কাঁটায় কাঁটায় কারেক্ট টাইম দেয়। নির্ভুল সময়টাই তো তোর এখন বেশী দরকার খোকা!'

বাবাকে দুঃখ দিতে চায়নি শিবেন। ঘড়িটা হাত পেতে নিয়েছিল। পুরনো ব্যাণ্ড পাল্টে নতুন খয়েরি রঙের একটা লাগিয়ে নিয়েছিল। উপরের নিকেল ঘষে মেজে যথাসম্ভব উজ্জ্বল করে তোলার চেষ্টা করেছিল। তারপর গোড়ার দিকের সঙ্কোচ ও অস্বস্তির ভাবটাও ক্রমশ কাটিয়ে উঠল। কেননা দেখল, ঘড়িটা সত্যি কাঁটায় কাঁটায় নির্ভুল সময় দেয়। এত নিরাপদ নির্ভরযোগ্য সময় যে তা নিয়ে সহপাঠীদের যে-কোনো দামের ও যে-কোনো মডেলের ঘড়ির সঙ্গে তাল ঠুকে বাজি ধরতে পারে এবং অনায়াসে জিতেও যায়। ফলে আস্তে আস্তে তার মনোভাব পাল্টে যেতে লাগল। আকৃতিতে যথেষ্ট বেঢপ হাস্যকর হওয়া সত্ত্বেও শুধু নির্ভুল সময়ের গুণেই একটু একটু করে ভালবাসতে শুরু করল। এরপর কেউ কোনো কটাক্ষ করলে সে রীতিমত তেড়ে উঠে বলত, 'ঘড়ির জন্য সময়, না সময়ের জন্য ঘড়ি? এই তো তোর হাতেরটা, কাল দেখলাম তিনমিনিট স্লো, আজ পাঁচমিনিট ফার্স্ট! এমন মাথা-পাগলা যন্ত্র রাঁচিতে না পাঠিয়ে হাতে ঝুলিয়ে রাখার কি অর্থ হয়?'

শিবেনের বলার ভঙ্গিতে তখন রাগ থাকত, জিদও থাকত। এ নিয়ে বন্ধুরা কৌতুকবোধ করত। সহপাঠিনীদের মধ্যে সুধা চাপা হাসিতে মুখ উজ্জ্বল করে গম্ভীর গলায় বলত, 'নতুন একটা কিনছে না কেন জান? আসলে ও তো জানেই, দু'এক বছর পরে নতুন ঘড়ি, সোনার বোতাম, সোনার আংটি সব আপনা থেকেই এসে যাবে!'

'আর খাট পালং সোফাসেট আলমারি...,' কৃত্রিম গাম্ভীর্যে শিবেনও তালিকা বাড়িয়ে যেত, 'রেডিও ফ্রিজ ড্রেসিং টেবিল...এসব আসবে না?'

'আসতেও পারে!' ঝর ঝর হেসে সুধা অন্যদিকে মুখ ফেরাত।

কিন্তু আসেনি। ঘড়ি আংটি দূরে থাক একগাছা ফুলের মালাও আসেনি।

শুধু সুধা এসেছিল। একবস্ত্রে, কপর্দকশূন্য হয়ে। সুধার বাবা অবশ্য বড়োলোক ছিলেন না কিন্তু সে কারণে নয়। একটা ঘড়ি কি আংটি দেবার ক্ষমতা তাঁর ছিল। কিন্তু সেসব দূরের কথা, মেয়েকেই তিনি চালচুলোহীন শিবেনের হাতে দিতে রাজি হননি। ফলে অনেকদিন ধরে টানাটানি, মান-অভিমান, রাগারাগি। একদিন সুধা জিদ করে বাড়ি ছেড়ে চলে এল, শিবেনও জিদ করেই রেজিস্ট্রি বিয়ের পর কালীঘাটে গিয়ে মন্ত্র পড়ে পুজো দিয়ে বাসা বাঁধল। তারপর পুরনো সুধা নতুন বাসায় নববধূবেশে কিছুকাল নতুন

থাকল, পরে সময়ের নিয়মেই মাসঋতুবছর ভেঙে আবার পুরনো হয়ে গেল। কিন্তু বেচারা শিবেনের হাতঘড়িটা আর নতুন হ'ল না।

বিয়ের পর সুধা কিছুদিন অবশ্য বলত, 'তুমি মাসে মাসে আমাকে আলাদা করে দশটা টাকা দাও—ও-বছর নতুন ঘড়ি কিনে দেব।'

সন্দেহে চোখ ছোট করে শিবেন বলত, 'কেন বলত? ভাবছ আমি ঠকে গেছি? ঘড়ি, বোতাম, সোনার আংটি...'

গোল গোল চোখে হাসির ঝিলিক তুলে সুধা বলত, 'তা তো গেছই। কিগো, যাওনি?'

ক্ষণকাল গভীর মুখে তাকিয়ে থেকে শিবেন সহসা সুধাকে কাছে টেনে ঠোঁটে ঠোঁট ঘষতে ঘষতে বলত, 'যা পেয়েছি তারই বা তুলনা কি!'

সুধার আবদারে ক'মাস দশটাকা করে জমিয়েছিল শিবেন। তারপর বছর না ঘুরতেই একদিন রাগারাগি করে, কাঁদিয়ে কাটিয়ে সংসারে রীতিমত একটা বিপর্যয় এনে দস্যুর মত সুধার হাত থেকে টাকা ক'টা ছিনিয়ে নিল। ততদিনে তার একটা ছেলে জন্মেছে, আরেকটা শরীরে বাড়ছে। সংসারে অনেক খরচ, খরচের উপর খরচ। টাকা ক'টা নিয়ে বকেয়া বাড়ি ভাড়া মেটাল, ওষুধের দোকানের দেনা শুধল। তারপর রাতের দিকে অনেক সাধাসাধনায় সুধার মান ভাঙিয়ে কাছে টেনে পুরনো দিনের মত আদরে সোহাগে ঘনিষ্ঠ হতে হতে বোঝাল, 'তুমি এখনও ভারি সেন্টিমেন্টাল সুধা। পুরনোটা দিয়ে দিব্যি তো কাজ চলছে! নতুনের কি দরকার? ওসব সখশৌখিনতার চেয়ে সংসারের দাবি তো অনেক বড়। তাকেই তো আগে মেটাতে হবে। নতুন সময় কিনে শরীর সাজানোর সামর্থ্য কি আমাদের আছে? তুমিই বল না......'

সুধা কথা বলল না। শিবেনের বুকে মুখ রেখে নিঃশব্দে কাঁদল।

তারপর সেই হাঁ-মুখ সংসারের গর্ভে আর একটু ডুবে যেতেই শিবেনের কেমন মনে হতে লাগল, ক্রমশ সে বদলে যাচ্ছে উঁচু পাহাড়ের চূড়া থেকে গড়িয়ে-নামা প্রস্তরখণ্ড ঘর্ষণে ঘর্ষণে ক্রমশ যেমন চূর্ণবিচূর্ণ হয়—শিবেনের মনের যাবতীয় সুকুমার বৃত্তিগুলিও প্রথমে দানা বেঁধে শক্তকঠিন, পরে কঠিনতর কোনো বস্তুর সংঘর্ষে ছিন্নভিন্ন হয়ে অদৃশ্য হয়ে যেতে বসেছে। সে যেন মানুষ থেকে ক্রমশ যন্ত্রে পরিণত হচ্ছে। সময়ের লোমশ হাতের কর্কশ মুঠোয় আবেগ ও অনুভূতিহীন একটা অচেতন যন্ত্র। এখন কবিতায় আর আসক্তি নেই, ফুলদানিতে ফুল রাখে না, গানের সুর কোলাহল মনে হয়, ধূপের গন্ধে নাক জ্বালা করে। কিংবা এসব তো তুচ্ছ, মাথার উপর ওই-যে অনন্ত আকাশ

আর পায়ের নীচে বিশাল পৃথিবী তার দিকেও ক্ষণকাল দৃষ্টি দেবার অবসর নেই তার। কোথায় কখন যে কি ঋতুবদল ঘটছে, বৃক্ষশাখায় ফুল ফুটছে, পাখি ডাকছে, দুধসাদা বালিহাঁস ঝাঁক বেঁধে নীলদিগন্তে উড়ে যাচ্ছে আর জ্যোৎস্নায় মাখামাখি গঙ্গার জল পালতোলা নৌকার গায়ে ভেঙ্গে পড়ে কি আদর জানিয়ে যাচ্ছে—শিবেন এসব আর কিছু দেখে না, বোঝে না। তার বাড়ির এত কাছে গঙ্গা, তবু সুধার হাত মুঠোতে রেখে পুরনো ঘাটের সিঁড়িতে কতকাল পাশাপাশি বসে সে সূর্যাস্ত দেখেনি!

এখন শুধু কাজ আর কাজ। শুধু কর্তব্যবোধ আর দায়দায়িত্ব। যেমন শিবেনের তেমনি সুধার—উদয়াস্ত কাজের তাড়না থেকে একমুহূর্ত বিশ্রাম নেই কারো. মুহূর্তের জন্য মুক্তি নেই। দু'জনের সংসার ক'বছরে বেড়ে চার-জনের হয়েছে। মাত্র চারজনের—তবু মনে হয় চল্লিশজন। যেন চল্লিশটা মানুষের বোঝা বুকেপিঠে। তাল তাল লোহার মত ভারি, পাহাড়ের মত অনড়—রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যায়, দম আটকে আসে, ক্লান্তিতে-ঘামে রাগে-বিরক্তিতে, ক্ষোভে-তিক্ততায় শরীর অবশ হয়, মনটা হিংস্র। এক এক সময় ইচ্ছে হয় বউবাচ্চাসমেত গোটা সংসারটাকেই দুই হাতে গলা টিপে ধরে—

কেন এমন হ'ল, কেন এমন হয়···শিবেন এখনও স্পষ্ট বুঝতে পারে না বলে দিশেহারার মত নিজেকেই শতবার প্রশ্ন করে। জটিল অরণ্যে পথ হারিয়ে পথ খোঁজার মত ধাঁধাপথের বৃত্তে প্রশ্নগুলো যত ঘুরপাক খায়, শিবেনের রক্তে ততই অস্থিরতা সংক্রামিত হয়। বুকের ভাঁজে গভীর কষ্ট জমা রেখে সে ভাবে, সুধা, আমি, আমার সন্তানসন্ততি, আমার ভালবাসা আর ভাল-বাসার ঘর···এসব তো কেউ চাপিয়ে দেয় নি আমার উপর···আমিই তো তাকে সৃষ্টি করেছি। যেমন একদিন কবিতাকে নির্মাণ করতাম শব্দ গেঁথে, পরিপাটি সাজাতে চাইতাম ছন্দে-অলঙ্কারে, তেমনি জীবনের রূপশালায় ভাল-বাসার মাটি ছেনেছেনেইতো সুধার মূর্তি গড়েছি, আমাদের ঘর বানিয়েছি। তারপর সুধাকে ভেঙ্গে, নিজেকে ভেঙ্গে শরীরের শরীর থেকে শরীর তুলে আমাদের সন্তানের চোখে চোখ, মুখে ভাষা, রক্তে রক্তস্রোত দিয়েছি। তারা তো আমারই নির্মাণ। তবে তারা আজ সহসা এমন গুরুভার বোঝা হয়ে গেল কি করে! ক্ষণে ক্ষণে এমন বিস্বাদ, ক্ষণে ক্ষণে এত তিক্ত, এমন অবাঞ্ছিত, বহিরাগত? ভালবাসার নির্মলতায় জলতলের গভীরে দ্বেষ-বিদ্বেষের এত পঙ্কিলতা কোথায় গোপন রেখেছিলাম! যদি না রাখব তবে সেদিন এমন কুৎসিত গলায় সুধা কেন চেঁচিয়ে উঠে বলল, 'ভুল করেছি। তোমাকে বিয়ে

করে ভুল করেছি। গলায় দড়ি জোটে নি আমার…' ;—আর তার চেয়ে জোরে তার চেয়েও কর্কশ গলায় কেন আমি ধমকে উঠলাম, 'জুটলে তুমিও বাঁচতে আমিও বাঁচতাম। যাও না, যাও! যেখানে খুশি চলে যাও…'

……কেন? কেন এমন হবে? কেন এমন হয়? আমরা কার কাছে কি অপরাধ করেছি? জীবনের আদর সোহাগ ভালবাসা, নম্রতা সহিষ্ণুতা সৌজন্য-বোধ কার কাছে বন্ধক দিয়েছি? যন্ত্রণার মূল্যে, অসম্মানের মূল্যে কে তার সুদের কড়ি গুণে নিয়ে যাচ্ছে? কার রক্তচক্ষুর দাপটে প্রতিদিন শুকিয়ে উঠছি? আমার ভালবাসার সংসারে, তৃষ্ণার জলে, ক্ষুধার অন্নে কার বিষ-নিশ্বাস ছোবল বসাচ্ছে?

—বর্শাফলকের মত প্রশ্নগুলো উদ্যত করে শিবেন কিন্তু সঠিক উত্তর জানে না বলে বন্যার ঘূর্ণিজলে গাছপাতামাছের মত ঘুরপাক খায়। কখনো মনে হয়—তার অযোগ্যতাই দায়ী, কেননা সামান্য গ্র্যাজুয়েট সে, স্বল্পবেতনের চাকুরি ভিন্ন উপার্জনের অন্যরাস্তা খোলা নেই। নিজের জীবন নিজের অযোগ্যতা দিয়ে নিজেই সে বন্ধ্যা করেছে! কখনো মনে হয়, কুড়িয়ে-বাড়িয়ে টাকা তো কিছু কম আনে না সে। এই উপার্জনেও দিব্যি গুছিয়ে সংসার চালানো যায় যদি সুধা আর একটু সতর্ক, আর একটু হিসেবি হয়! অ-গোছালো সুধার বুদ্ধিহীনতার জন্যই…। আবার কখনো ভাবে, জিনিষপত্রের হু হু বেড়ে-ওঠা দরদামটাই সংসারের সবকিছু তছনছ করে দিচ্ছে তার। চাকরির উপর ওভার-টাইম, সকালসন্ধ্যা টিউশনি—এত করেও সামাল দেওয়া যাচ্ছে না। উপার্জনের চারদিক ঘিরে খরচখরচার কালো হাত কঙ্কালের মত থাবা নাচিয়ে কেবলই চিৎকার করছে, 'আরো আনো, আরো চাই। আনো আনো, চাই চাই…' হাড়ের আঙুলের খটাখট শব্দে ভয় পেয়ে সুখের বাসা থেকে ভালবাসার পাখিরা দ্রুত পালিয়ে যাচ্ছে…সমস্ত সংসার ঘিরে ফণিমনসা আর কাঁটাগাছের ঝোপ প্রতি মুহূর্তে বেড়ে উঠছে!

শিবেন কোন্‌টাকে ঠেকাবে! কি দিয়ে ঠেকাবে! উপার্জন বাড়ানোর ক্ষমতা নেই তার। কিংবা ক্ষমতা থাকলেও সময় নেই। সময়ের বুকে সময় ভেঙে, সময়ের চাকায় সময় ঘুরিয়ে, সময়ের কাছে সময়কে বাঁধা দিয়ে তবেই তো উপার্জন। তার এতটুকুও আর অবশিষ্ট রাখে নি শিবেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত সবটুকু সময়কেই সময়ের কাছে বিক্রি করেছে সে। এখন সময়ের সময়হীনতার কাছেই সে কিনা বলিপ্রদত্ত!

আসলে এই সময়ই……

......যেন এতদিনে, এতক্ষণে আসল শত্রুটাকে খুঁজে পেয়েছে এমন ভঙ্গিতে চোখমুখ ধারালো কঠিন করে উঠে দাঁড়ায় সে। উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে। অবয়বহীন অশরীরী শত্রু...কিন্তু আছে, সে আছে! তাকে ঘিরে, তার সংসারকে ঘিরে ভয়ংকর অদৃশ্য থাবা মেলে দিক্‌দিগন্তে ছড়িয়ে আছে। সপ্তাশ্ববাহিত সূর্যরথে মহাকাল যে সময়কে কাল থেকে কালান্তরে বহন করে—তার রূপ জ্যোতিষ্মান্ কিনা শিবেন জানে না। তাকে কখনো অনুভবে পায় নি। এই মুহূর্তে স্ত্রীপুত্র-সন্তান-সন্ততিসহ তাকে ঘিরে যে সময় সে বড় কুটিল, বড় হিংস্র! শিবেন তার দিকেই প্রশ্ন ও ঘৃণাকে উদ্যত করে। আর তখুনি ছোট হাতঘড়িটাকে প্রবলভাবে ভয় পেতে ও তার উপর রাগ করতে থাকে, কেননা মহাকাল-পরিব্যাপ্ত সময়েরই তো এটা এক খণ্ডাকৃতি অণুপরিমাণরূপ। শিবেনের সময় তো তাকে ঘিরেই! ঘড়িটার দিকে তাকানো মাত্র তার মনে হয়—সময়ের এই যন্ত্রটাই আমার সব সময় কেড়ে নিয়েছে। রক্তচোষা বাদুড়ের মত আমাকে শোষণ করে পাণ্ডুর বিবর্ণ করে তুলছে...মানুষ থেকে ক্রমশ ভারবাহী ক্রীতদাসে পরিণত করছে!

অথচ পৈত্রিকস্মৃতি বহনকারী এই সময়-যন্ত্রটার একদিন আমি প্রভু ছিলাম। নির্ভেজাল শর্তহীন প্রভু। আমার নির্দেশে আমার সময়কে আমারই মর্জিমত বহন করতে বাধ্য ছিল সে। সেদিন আমার ইচ্ছে হলে একটা ট্রেন ছেড়ে আরেকটা ধরতাম, কোনো ট্রেন না-ধরেও ঘরে শুয়ে বসে কাটাতে পারতাম, ক্লাস ছেড়ে দিয়ে সুধার সঙ্গে বন্দরে বিদেশী জাহাজ কি বোটানিক্যালে শতাব্দী-প্রাচীন বটবৃক্ষ দেখে নৌকায় ঘুরতে পারতাম।...এমন কি বিয়ের পরেও বেশ কিছুদিন প্রভুত্ব বজায় রেখে চোখ রাঙিয়ে বলতে পারতাম, 'তুমি দশটা বাজাও কি বারোটা, এই গঙ্গার ঘাট ছেড়ে আমরা উঠছি না। দেখছ না, দুধের মত সাদা পালে পূর্ণিমার হলুদ চাঁদ সোনার রঙে গলে গলে ঝরছে...ঝর ঝর গাছের পাতায় বসন্তের বাতাস গান গাইছে...জলের বুকে আলোছায়ার কম্পনে মায়াবি খেলা শুরু হয়েছে...যদি সারারাত ঘরে না ফিরি, তোমার কি!'

তারপর পাশার দান উল্টে গেল! ঘড়িটা প্রভু, শিবেন দাস। সময় আর শিবেনের কথা শোনে না, শিবেনকেই তার কথা শুনতে হয়। নির্মম হৃদয়হীন প্রভু—অবাধ্যতা ক্ষমা করে না।

এখন ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দের মধ্যে বাঘের গলার গরগর শাসানি শোনে শিবেন, কাঁটা দুটোকে প্রহার-উদ্যত চাবুক মনে হয়, আর অঙ্কের সংখ্যাগুলোকে এক একটা প্রস্তরখণ্ড, যেন সবেগে তার হৃদ্‌পিণ্ডের দিকে নিক্ষিপ্ত হওয়ার জন্য

প্রস্তুত হয়েই আছে। এখন মহাকালের অণু-পরমাণুরূপ অতি ক্ষুদ্র এই যন্ত্রের কাছে সে বড় অসহায়, বড় অল্পমূল্যে কেনা এক ক্রীতদাস!

এখন সকালে ঘুম থেকে উঠে সবার আগে সব কাজ ফেলে ত্রস্ত বিচলিত ভঙ্গিতে ঘড়ির কাঁটা দেখে শিবেন। দেখে আর চমকে ওঠে! ছ'টা বেজে বারো! সর্বনাশ! কই, কোথায় গেলে তুমি? আগে ডেকে দিতে পার নি! কি কাণ্ড! ঘড়ি দেখতেও ভুলে গেছ?·· ছ'টা বাইশ. চা? চা কই? রুটি সেঁকো নি? ···ছ'টা সাতাশ, চিরুনিটা কোথায় গেল? কলমটা? বাবলু ওঠ, ওঠ বলছি! এই পারুল!···ছ'টা চল্লিশ,·· ছাত্রের বাড়ি। এ টু দি পাওয়ার ফোর, বি টু দি পাওয়ার এইট, চল্লিশ ফুট তৈলাক্ত বাঁশে একটা বাঁদর প্রতি মিনিটে তিন ফুট ওঠে, আড়াই ফুট নামে···বাঁদর কেন, সে তো আমি, এই আমি······

···ন'টা বাজতে তিন মিনিট, দাড়ি কাটার খরখর শব্দ। ন'টা পাঁচ, তেল সাবান গামছা বাথরুম। ন'টা পনেরো, ভাত, ভাত দাও শীগগির, তোমার আলুচচ্চড়ি নিপাত যাক, ভাত দেবে তো দাও এখুনি ·····

···ন'টা চল্লিশ, স্টেশনমুখো। ছুটছে শিবেন, মাঘ ফাল্গুন জ্যৈষ্ঠের রৌদ্র শরীর থেকে পিছলে পড়ছে, ঘাড়ে গলায় বুকে ঘাম জমতে শুরু করেছে, পায়ের শিরা টনটন করছে। ন'টা আটচল্লিশ, কে ডাকে? কে? পরে, পরে কথা হবে! এখন সময় নেই, দাঁড়ানোর সময় নেই, তাকানোর সময় নেই, ন'টা পঞ্চাশ প্ল্যাটফর্মে ইন্ করছে· ···

·····হ্যাঁলো, কে? সেজপিসী? রুনুর পাকা দেখা? না, না বিকেলে যেতে পারব না! অসম্ভব···অসম্ভব! কাজ, কাজের তলায় চাপা পড়েছি। সাতটা পর্যন্ত ওভারটাইম। জরুরী অবস্থা! মরারও ফুরসুৎ নেই। বিয়ের দিন? আচ্ছা দেখব!······না, শশাঙ্ক ভুল বুঝিস না! নাটক সিনেমা দেখা ভুলে গেছি! এখন সংসার দেখি আর ঘড়ি দেখি! বাড়ি ফিরে চা খাওয়ার সময়টুকুও হয় না। কেরোসিনের লাইন দিতে হবে, সকালের হাটবাজার সারতে হবে, রেশন তুলতে হবে, গম ভাঙাতে হবে······ঠিক আটটায় পৌঁছে যেতে হবে ছাত্রীর বাড়ি। তারপর প্যাসিভ ভয়েস, ইনডাইরেক্ট ন্যারেসান, আয়তক্ষেত্র বর্গক্ষেত্র সমকোণ, চল্লিশ ফুট তৈলাক্ত বাঁশে······

···রাত দশটা পঁচিশ। ক্লান্তিতে শরীর ভাঙছে, ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে, শূন্য পাকস্থলী ব্যথায় মোচড় দিচ্ছে, গরম বাতাসে চামড়া ঝলসে যাচ্ছে কিংবা শীতের ঠাণ্ডায় হাড়পাঁজর জমে উঠছে······গাছপালা আকাশমাটি অন্ধকার······

'নিরবধি অন্ধকারে প্রতিবিম্ব দর্পণ ধরে না'— কবিতায় একসময় আমিই কি লিখেছিলাম? বলেছিলাম, 'একথা নিশ্চিত জেনেও দিকভ্রষ্ট তবু সে যুবক/ আপন অঙ্গুলি কেটে গুরুবাদে সঁপিল দক্ষিণা / আহত বুদ্ধির স্বর্গে শূন্যতার মূঢ় উপাসক'......কার কথা লিখেছিলাম! সে কি আমি, -আমার এই ভবিষ্যৎ জীবনের কথা!

......খোকা, রাগ করিস না বাবা, এই রোববারে অনেক কাজ, পরের রোববারেও পারব না, যদি গুরু নানকের ছুটি থাকে কোলকাতায় নিয়ে তোদের মিউজিয়াম দেখাব, ময়দানে পুতুলনাচ দেখাব, শিশুমেলায় গল্পের বই কিনে দেব......না না দেখিস, এবার ঠিক নিয়ে যাব...ঠিক...

...শুয়োরের বাচ্চারা! ফের যদি ঘ্যান ঘ্যান করিস কষে লাথি মারব। এমন লাথি ভাইবোনে ছিটকে পড়বি রাস্তায়। নাকে মুখে রক্ত ছুটে আসবে! সাপের পাঁচ পা দেখেছিস জানোয়ারেরা!

......সুধা, তুমি থাম! অসহ্য! তুমি থাম! যেমন মা, তেমন ছা! হ্যাঁ, গলা টিপেই মেরে ফেলা উচিত! বিষ? পারো না? নিজের বিষটুকু নিজে যোগাড় করতে পারো না?......

সময়! আমার সময়!

মহাকালের থাবার মধ্যে মোমবাতির মতো সময় গলে গলে পড়ে। সময়ের তাড়নায় সময়ের অরণ্যে আমরা প্রত্যহের চতুর নিষাদ হয়ে যাই। অন্য মৃগয়ার সন্ধান জানি না বলে নিজের শরীর নিজেই তীরে বিদ্ধ করি। নিজের হৃদ্‌পিণ্ডে নিজেই অস্ত্র বসাই......

আর বুক ভেঙ্গে চোখের জল রক্তের ধারা হয়ে নামে। সেই ধারাস্রোতে সন্তানসন্ততিসহ আমার সংসার টালমাটাল ভাসতে থাকে। আর সময়ের আগুন আমাকে ঘিরে উল্লাসে নৃত্য করে। নাচতে নাচতে গণ্ডী ছোট করে শরীরে তাপ ছড়ায়। আমি একটু একটু করে পুড়তে থাকি, আমার কচি অবুঝ ছেলেমেয়েদের ভালবাসার নরম শরীর আগুনে ঝলসে যেতে থাকে। আমার সারা সংসার থেকে কাঁচা মাংসের পোড়া গন্ধ ওঠে......

এইসময় শিবেনের ইচ্ছে হয় গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে ওঠে। তীব্র, তীক্ষ্ণ আর্ত চিৎকার। অরণ্যে দাবানল জ্বলে উঠলে গাছের কোটর ছেড়ে পাখিরা যেমন আকাশে ডানা ঝাপটে-ঝাপটে আর্তনাদ করে কিংবা মাটিতে ধাবমান হরিণশিশুরা দিকদিগন্ত কান্নায় ভরিয়ে তোলে, শিবেনেরও ইচ্ছে হয়

সেইভাবে আকাশমাটি চিরেফেঁড়ে চেঁচিয়ে ওঠে, 'বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও! দস্যুর মত সময় আমার গলায় ফাঁস জড়াচ্ছে, সাপের মত রক্তে বিষ ঢালছে, বাঘের মত রক্তমাংস খুবলে খাচ্ছে। আগুনের নীলবেগুনি শিখা হয়ে, আগুনের কঙ্কালমূর্তি ধরে হা হা অট্টহাস্যে তাণ্ডবনৃত্য করছে। দেখ, আমার হৃদপিণ্ড ফেটে চৌচির, আমার তৃষ্ণার জল শুকিয়ে মরুভূমি, আমার ক্ষুধার অন্ন বিষে বিষে নীল, আমার আদর সোহাগ ভালবাসার শরীরে পোড়া মাংসের গন্ধ—আমাকে বাঁচাও!'

চিৎকার করতে চায় কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরোয় না! বুকের ভেতর যন্ত্রণার স্তরবদ্ধ মাটি ভূমিকম্পে থর থর কাঁপে। শত্রু অদৃশ্য থাকায় এবং সময়ের জ্যোতিষ্মান্ রূপ অনুভবে না পাওয়ায় বিপর্যস্ত শিবেন ভয়ে আতঙ্কে বিবর্ণ হতে হতে একসময় বরফের শীতলতায় শক্ত হয়ে যায়।

আর সুধার দু'গাল বেয়ে জলের ধারা নামে। জনকজননীকেই ঘাতক মনে করে ছেলেমেয়েদুটো নিশি-পাওয়া ভয়ের তাড়নে ডুকরে কাঁদে।

আর এসব কোনো কিছুতে তিল পরিমাণ ভ্রূক্ষেপ না করে লোমশ সময় ভয়ঙ্কর লোহার খাঁচায় কালের প্রহর বাজিয়ে যায়—টক্...টক্...টক্ —যেন বধ্যমঞ্চে ফাঁসীর আসামীকে নিষ্ঠুর ঘাতক মৃত্যুর নিকটবর্তী সময় শুনিয়ে যায়—আটটা পঁচিশ...ন'টা বাইশ...দশটা কুড়ি ..এগারোটা......

দারুণ আতঙ্কে ও ঘৃণায় মুখ কালো করে ঠিক তখনই ঘড়িটা হাতে তুলে নেয় শিবেন। রাত এগারোটা দম দেবার নির্দিষ্ট সময়। হাতের মুঠোয় শক্ত ভাবে চেপে ধরে হিংস্র দুই আঙুলের মোচড় দিয়ে চাবি ঘোরায়—ক্রিক্...ক্রিক্... ক্রিক্...। যেন চাবুক খাওয়া দাসশ্রমিক পিঠে রক্তের দাগ এবং বুকে কষ্ট পুষে রেখে বিশ্বস্ত তৎপরতায় সামন্তপ্রভুর সেবা করে!

এবং এইভাবে, শিবেন নামক মধ্যবিত্ত যুবকটি, নতুন সময় কেনার ক্ষমতা ও সাহস নেই বলেই, পুরনো সময়ের প্রভুত্বকে সচল রাখার যথাসাধ্য যত্ন নেয়। কিংবা এই সময়ের হাতে তার সমূহ বিনষ্টি জেনেও নিঃশর্ত আত্ম-সমর্পণ করে, যেমন মৃত্যু অনিবার্য জেনেও কোনো রাক্ষুসে-ফুলের হাঁ-মুখে কীটপতঙ্গেরা ধরা দেয় অথবা মাকড়সার জালে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে। এখন সকালে উঠে সকলের আগে সে' ঘড়িটারই খোঁজ করে। তার নির্ভুল সচলতায় খুশি হয়। তারপর ঘড়ির সময়ের মধ্যে সারাদিনের জীবন নিঃশেষে সমর্পণ করে বাঁধা বৃত্তে ঘুরপাক খেতে থাকে। তার কোনো স্বাধীন গতি নেই। ঘাড়ের উপর ঘড়িটাই তার রক্তচক্ষু চালক!

তারপর একদিন সময়ের নিয়মেই সময় পুরনো হয়। নিজের মধ্যেই নিজেকে ভাঙ্গতে থাকে। শিবেনের ঘড়িটাও পুরনো হতে হতে একসময় নির্ভুল সময় গণনা বন্ধ করে। নিজের মধ্যে নিজেই ভেঙ্গেচুরে হঠাৎ-হঠাৎ বিগড়ে যেতে থাকে। স্তম্ভিত শিবেন দেখে, খাঁচা থেকে রাক্ষুসে শব্দটা আর শোনা যাচ্ছে না, কাঁটা দুটো দু'দিকে স্থির অনড়। হাতে তুলে প্রবল ঝাঁকুনি দেয়—তবু নড়াচড়া করে না। মৃত জন্তুর বিস্ফারিত চোখের মত কঠিন শীতল দৃষ্টিতে শুধু চেয়ে থাকে।

তখন শিবেনের আরেকরকম ক্রুদ্ধ ভঙ্গি। কেননা সে বেশ বুঝতে পারে—ঘড়িটা মরে নি, মরার ভাণ করছে মাত্র। ঘরের সেবাযত্নে চলছে না, বাইরের ডাক্তারবদ্যি চাই!

বার দুই এ রকম হতে সে নিজের মনেই গর্জে বলে, 'শালা, বাপের তেল দেখেছ! এবার তোমার পিণ্ডি না চটকাই তো...'

কিন্তু আবার দোকানে দিয়ে আসে।

ঝাঁঝের সঙ্গে দুশ্চিন্তা আর আবেগ মিশিয়ে বলে, 'এমন তো ছিল না! কি যে হচ্ছে! বাপের আমলের জিনিস, ফেলতেও পারি না! এবার একটু যত্ন নিয়ে দেখবেন ভাই, আর যেন গাঁটের কড়ি না গুনতে হয়।'

নতুন সময় কেনার সামর্থ্য নেই। ঝুঁকিও অনেক! ধার দেনা বেড়ে উঠবে, মুখের আহারে টান পড়বে, সংসারে প্রলয় ঘটবে। এত ঝামেলার দরকার কি! তুমি ভাই ওটাই সারিয়েসুরিয়ে দাও। দু'একটা পার্টস বদলাতে হয় বদলাও। ভাল করে তেলজল দাও। উপরের নিকেলটা ঘষেমেজে চকচকে করে তোল। কি করব! আর কি করার আছে আমার। তুমি তালিতাপ্পি দিয়ে শোধন করে দাও, আমি আবার হাতে ঝুলিয়ে কলুর বলদ হয়ে যাই! যতই রক্ত ঝরাক, ওটার শাসনতর্জন না হলে আমার উপার্জন যে এলোমেলো হয়ে যায়, বাঁধা পথের শান্তিস্বস্তি ভেঙ্গে খান খান হয়......

ফলে আবার পুরনো সময় নিয়ে পুরনো ঘড়িটাই ফিরে আসে!

ফিরে আসে বটে কিন্তু আগের মত হয় না। এত সারাইসুরাই, এত যত্নআত্তির পরেও নির্ভুল সময় দিতে অস্বীকার করে। হঠাৎ-হঠাৎ কেমন পেছনে হাঁটে। কখনো তিন মিনিট, কখনো পাঁচ, কখনো দশ। কেবল পেছনেই হাঁটে, ভুলেও সামনে যায় না!

গোড়ার দিকে এর প্রতারণা ধরতে পারে নি শিবেন। ফলে একমাসে তিনবার ন'টা পঞ্চাশ ফেল্ হয়ে গেল! দেশ যেখানে দ্রুত সমৃদ্ধির পথে সেখানে বিপর্যস্ত শিবেন ধীরগতিতে দেড় ঘণ্টা লেটে অফিসে পৌঁছাল! অফিস-

ইন-চার্জ আগুনাথ ভুরু কুঁচকে বললেন, 'অর্ধেক দিন যে পার করে এলে ভাই! যাও, সেনসাহেবের ঘরে যাও।'

অপ্রস্তুত বিব্রত শিবেনকে বলতে হ'ল, 'ঘড়িটা আজও তিন মিনিট···'

আগুনাথ একরকম ধমকে উঠলেন, 'সেদিনও একথাই বলেছিলে! পাল্টাও হে. পাল্টাও। পুরনো ঘড়ি আর অসতী বউ···'

শিবেন দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'পাল্টাব।'

তারপর আর কথা খুঁজে না পেয়ে মনে মনে আগুনাথকে খিস্তি করল! শালা, তোমার আর কি, তুমি তো বলেই খালাস। পোষমানা ভেড়া হয়ে মালিকের ঘড়ি হাতে বেঁধে শকুনের মতো মালিকের সময় আগলাচ্ছ! আমার নতুন ঘড়ির জন্য তোমার দরদের অর্থ বুঝি না ভেবেছ! সে কি আমার স্বার্থে, না তুমি যার পোষমানা পা-চাটা, তার স্বার্থে! আর অসতী বউ! সে অভিজ্ঞতা তোমার চেয়ে বেশী কার! তোমার দুইনম্বরী বউটা তো সেন-সাহেবের সঙ্গে......শালা! তুমি কিনা আমার রুচি আর অক্ষমতা নিয়ে খোঁচা দাও! তোমার কথায় ঘড়ি আমি পাল্টাব না ঘোষালমশাই। সে যদি পাল্টাই আমার মর্জিমাফিক আমার সময়ের মাপেই পাল্টাব! এখন সারিয়ে-সুরিয়ে এটা দিয়েই দশবছর চালাব আমি···

······কিন্তু সময় পেছনে হাঁটার বিপদ যে অনেক! শিবেন কি এখনো তা বোঝে! তার সময়ের বাইরে মহাকালে মহাবিশ্বে প্রসারিত যে সময় সে তো ভুলেও কখনো পেছনে হাঁটে না। সপ্তাশ্ববাহিত সূর্যের অগ্নিরথে দিগন্ত উদ্ভাসিত তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ রূপ নিয়ে ক্ষিপ্রবেগে কেবলই যে আগে ছোটে। তার চলার ছন্দেই তো গ্রহনক্ষত্রেরা ছুটতে থাকে, প্রকৃতিতে ঋতুবদল ঘটে, পাহাড় ভেঙ্গে সমুদ্র হয়, সমুদ্র ভরাট হয়ে অরণ্য মাথা তোলে, মরুর বুকে শস্যের সমারোহে ফুল ফোটে, ফল পাকে, পাখিরা গান গায়···

আর মানুষ চার পা থেকে দু'পায়ে হাঁটে, পাথর ঘষে আগুন জ্বালে, গুহা ছেড়ে ঘর বানায়, বন কেটে বসত গড়ে, লোহার হাতিয়ার থেকে বারুদের অস্ত্র হাতে ইতিহাসের গতিপথে ছুটে যায়, এক সমাজের গর্ভ থেকে আরেক সমাজ ছিনিয়ে আনে···

এই সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতে না পারলেই তো চাবুক পড়ে পিঠে। সময়ের প্রদীপ্ত মূর্তি মুহূর্তেই অমাবস্যার অন্ধকার হয়। তার লোমশ থাবা শরীরের রক্তমাংস খুবলে খায়।

শিবেন বুঝি তারই শিকার হয়ে আছে। সময়ের নিয়ত সম্মুখবর্তী

জ্যোতির্ময় আবর্তনের সংবাদ বুঝি তার চেতনায় বিন্দুমাত্র পৌঁছায় নি। শত প্রহারে জর্জরিত হয়েও সে বুঝি পুরনো সময়ের বৃত্তেই ঘুরপাক খেতে চায়। শুধু তার যন্ত্রণা একটু সহনীয়, বিভীষিকা অল্প শান্ত, আর হিংস্রতাকে কিছু কোমল করে তোলাই তার মনোগত অভিপ্রায়।

অন্তত এতদিন যে তা-ই ছিল—তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু পুরনো সময় ঘন ঘন বিশ্বাসঘাতকতা শুরু করতেই সে কেমন বিপর্যস্ত হয়ে গেল। আর পর পর কিছু বিপর্যয়ের ফলে তার মধ্যে অদ্ভুত একপ্রকার ক্ষিপ্ততাও দেখা দিল। যেন ক্রোধ ও ঘৃণার আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ল, ক্ষতস্থানে নুনের ছিটে লাগল। সময়ের বাঁধাপথে নির্ভুল চলতে চলতে যে-কিনা হঠাৎ রং পাল্টায়, ভোল বদল করে—তার বহুরূপী-রূপের মধ্যে জীবনযাপনকে বেঁধে রাখা কঠিন। শত্রু আবরণহীন হলে মুখোমুখি দাঁড়ানো সহজ হয়, ছদ্মবেশ ধারণ করলে বিপদ সাংঘাতিক—

আর একদিন ট্রেন ফেল হতে বিভ্রান্ত সময়ের বৃত্তে উৎক্ষিপ্ত শিবেন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েই ডানহাতের থাবা দিয়ে ঘড়িটার মুণ্ডু সাঁড়াশীর মতো চেপে ধরল. 'শুয়োরের বাচ্চা! প্রভুত্বকে মেনেছি বলে প্রতারণার অধিকার দিয়েছি? ভেবেছিস তোকে ছাড়া আমার চলবে না! দেখ এবার কি করি—'

নিরীহ নির্বিরোধী শিবেনের চেতনায় এই ভঙ্গিটা উদ্ধত এবং এই ভাবটা নতুন। শরবিদ্ধ সিংহ আত্মরক্ষার জন্য ভীত পলায়নপর হয়েও অকস্মাৎ যেমন কেশর ফুলিয়ে ঘুরে দাঁড়ায়—শিবেনও তেমনি এতদিন পরে ক্রীতদাসের সত্তা থেকে নখদন্ত বিস্তার করল। যেন এই প্রথম অস্পষ্টভাবে অনুভব করল, সময়ের শরশয্যায় শুয়ে সময়ের বিরুদ্ধে ডানা ঝাপটে ক্রমাগত কাতর আর্তনাদ আসলে গোপন-সন্ধিস্থাপনেরই করুণ প্রার্থনা! বিশেষত যে-সময় মোহিনী-মায়ার আড়ালে বিশ্বাসঘাতিনী হয়েছে তাকে ক্ষমা করলে একদিন তোমার খাদ্যে সে অবশ্যই বিষ মেশাবে! বশ্যতা ছেড়ে এই সময়কে এখুনি আঘাত করা উচিত। কেননা কালধর্মে সে নিশ্চয়ই ভেতরে ভেতরে দুর্বল হয়েছে, প্রতারণা সেই দুর্বলতা ঢাকার মুখোশমাত্র. মুখোশ ধরে এখুনি টান না দিলে সামনেই নিশ্চিত ঘনায়মান বিপদ—

•

এই যেমন আজই!

প্রতারক ঘড়িটা আড়াই মিনিট স্লো হয়ে বসেছে শিবেন ধরতেই পারে নি। ন'টা পঞ্চাশ ততক্ষণে রীতিমত স্পীড্ নিয়েছে! শিবেনও ছুটছে……

দাঁতে দাঁত চেপে, দম বন্ধ করে, বিস্ফারিত চোখে, ট্রেনের শেষ কামরা লক্ষ্য করে তাড়া-খাওয়া জন্তুর মতো......

তারপর হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে চোখ বুজে অকস্মাৎ ঝাঁপ দিয়ে পড়ল......

আর সঙ্গে সঙ্গে অনেক মানুষের প্রবল উচ্চকিত চিৎকার। যেন মধ্য-রাতে বুক-প্রমাণ বন্যার জল ঢুকে পড়েছে ঘরে এমন ব্যাকুল আতঙ্কিত হৈ-হৈ রব। শিবেনের আধখানা শরীর বাইরে, আধখানা ভেতরে। অনেকগুলো হাত সবলে যেন টেনে ধরল তাকে, ক্রমাগত টানতে লাগল. বাইরে ছিটকে যেতে যেতেও শিবেন অনুভব করল সে আসলে ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে... আরো ভেতরে!...কারা যেন এপাশে-ওপাশে সরে গিয়ে যথেষ্ট স্বচ্ছন্দ জায়গা করে দিল।...কারা? তারাই কি...এই সেদিনও যাদের ধূর্ত ইতর অমানবিক ভেবেছিল সে? সেইসব সঙ্কীর্ণ স্বার্থপর মধ্যবিত্ত নিত্যযাত্রীরা?

কি? কি বলছে তারা?

শিবেন ঠিক বুঝতে পারল না, কেননা এখন তার রক্ত চলাচল বন্ধ। সমস্ত শরীর ভারহীন অবস্থায় শূন্যে ভাসমান। ইন্দ্রিয়ের সকল বোধ অবলুপ্ত। যেন জীবিত কি মৃত এটুকু বোঝার ক্ষমতাও নেই!

...ক্রমে ক্রমে দূরবর্তী শব্দধ্বনির মতো অস্তিত্বের বোধ যখন আবার ফিরে আসতে লাগল তখনও সে পুরোপুরি জাগল না। চৈতন্যে ফিরে আসতে ভয় পেল বলে তান্ত্রিকের যোগ-প্রক্রিয়ার মতো দেহকাণ্ডের সমস্ত ইন্দ্রিয় ও চিত্তবৃত্তি নিরেট নিরুদ্ধ করে দেয়ালে ঠেসানো অবস্থায় মৃতবৎ দাঁড়িয়ে থাকল। আর তখন আচ্ছন্ন অবশ চেতনার মধ্যে সে অস্পষ্টভাবে অনুভব করল, চারপাশের মানুষগুলো বিষাক্ত হুল্ ফোটানোর পরিবর্তে আশ্চর্য সমবেদনা ও সহানুভূতির শব্দসমষ্টি উচ্চারণ করছে, যার মধ্যে তিরস্কার আছে কিন্তু বিদ্রূপ নেই। মরে যেতাম? চাকার তলে চলে যেতাম? কপাল-জোরে বেঁচে গেছি?

কানের কাছেই কে যেন চিৎকার করে বলে উঠল, 'এই করেই আমাদের অফিসের সুধাময়...'

'আরে, আমাদের জলদদাও তো...'

'ইনিও যাচ্ছিলেন, আর একটু হলেই...' না-যাওয়ার গভীর স্বস্তিতে একটি বয়স্ককণ্ঠ যেন ঝাঁঝিয়ে উঠল।

তখন ইস্পাতে ইস্পাতে ঘর্ষণে প্রচণ্ড ধাতব শব্দ তুলে ইলেকট্রিক ট্রেন ছুটে চলেছে। শিবেনের সারা শরীর তখনও বিবশ। এমন দিকবিদিক্

জ্ঞানশূন্য হয়ে, এমন প্রাণঘাতী ঝুঁকি নিয়ে আর কখনো সে চলন্ত ট্রেনে ঝাঁপ দেয় নি। এখন স্পষ্ট অনুভব করছে, হাতলটা ধরার ক্ষেত্রে হাতটা যদি মাত্র এক সেকেণ্ডের শূন্যতা সৃষ্টি করত কিংবা তার টাল-খাওয়া শরীরটা শক্ত হাতে ধরে ফেলতে কেউ একমুহূর্তও দেরী করত তাহলে আজ নিশ্চিতই চাকার তলে চলে যেত সে। তারপর আর কোনো কাল্পনিক ব্যাপার না, একেবারে নৃশংস বাস্তবরূপেই এতদিনের এত যত্নের শরীরটা তালগোল পাকিয়ে চাকার সঙ্গে লাইনের সঙ্গে......

তখন আমার ছেলেমেয়ের মুখদুটো একমুহূর্তের জন্যও কি মনে করার অবসর পেতাম...একবারও কি হৃদ্‌পিণ্ড ফাটিয়ে চিৎকার করে বলে উঠতে পারতাম, 'সুধা...আমার সু-ধাআআ...'

খণ্ড খণ্ড মাংসের রক্তমাখা শরীর ততক্ষণে মাটিতে-পাথরে গড়াতে গড়াতে দূরে...কতদূরে...

মৃত্যুর বিবর্ণ হিমশীতলতা থেকে সদ্য প্রত্যাগত শিবেন এখনও ভয়ের তাড়নায় কাঁপছে। অনেকক্ষণ রক্ত চলাচল বন্ধ থাকার পর এতক্ষণে যেন গরম প্রবাহ ঝলকে ঝলকে লাফিয়ে উঠে হৃদপিণ্ড আর মস্তিষ্কে ধাক্কা দিচ্ছে। গলগল করে নেমে-আসা ঘামের ধারাস্রোতে জামাকাপড় ভিজে উঠছে।

...কিন্তু কি করতে পারত সে? ঝুঁকি নিয়ে ঝাঁপিয়ে না পড়ে কি উপায় ছিল তার? পরের ট্রেনের জন্য প্ল্যাটফর্মে শুয়েবসে যদি অপেক্ষাই করতে পারবে—তবে তো কবিতা লেখার, ফুলের চাষ করার কিংবা সাদা-জ্যোৎস্নায় গঙ্গার ঘাটে সুধার হাত ধরে দু'দণ্ড বসে থাকারও সময় হ'ত তার!

...না, কিছু করার নেই। করার মতো মন নেই। সময় নেই। হিংস্র সময় তার সমস্ত সময় চেটেপুটে খেয়ে নিঃশেষ করেছে। তাতেও শান্তি হয় নি—এখন প্রতারকের ছদ্মবেশে বোধবুদ্ধিহীন শরীরটা গেলার জন্য মস্ত হাঁ করেছে! তার মুখের ভিতর রক্তমাখা ধারালো দাঁতগুলো ওই যে এখনও দেখা যাচ্ছে...

না, আর না।

আর একদিনও না, একমুহূর্তও না।

প্রতারক সময়ের এই ঘড়িটা আমি ভাঙব। নতুন সময় কিনতে পারি বা না পারি পুরনো সময়ের খাঁচায় তালিতাপ্পি বন্ধ করব, পাথর দিয়ে ঠুকে ঠুকে এর সমস্ত কলকজা চূর্ণ করব। আমি। ভাঙব। এই ঘড়িটা। আজই...

কিন্তু…

পারব ত? পারব কি!

প্রখর উত্তেজনা ঘাম হয়ে ঝরছে। চোখ মুখ উদ্‌ভ্রান্ত। শরীরের প্রতি লোমে প্রবল অস্থিরতা। আর বুকের ভাঁজে ভাঁজে সময়ের প্রহারজনিত অবিরাম রক্তক্ষরণ। দাঁতে দাঁত চেপে হিংস্র বিপর্যস্ত ভঙ্গিতে প্রত্যয়ের বোধ চেতনায় ছড়িয়ে-আবার উচ্চারণ করল শিবেন, 'ভাঙব! আজই। পারব ত? পারব কি……'

আর তৎক্ষণাৎ সে যেন, বহু-বহু-দূরাগত আলোকরশ্মির মতো. অস্পষ্ট আচ্ছন্নভাবে অনুভব করল—মহাকালে মহাবিশ্বে পরিব্যাপ্ত সময় সপ্তাশ্ববাহিত সূর্যের অগ্নিরথে পুঞ্জ পুঞ্জ জ্যোতিঃকণা দিকদিগন্তে বিচ্ছুরিত করতে করতে তুরন্তগতিতে সম্মুখপানে ছুটে চলেছে। আশ্চর্য জ্যোতির্ময় তার রূপ!

আর তার সঙ্গে পাল্লা দেবে বলে বাতাসের সঙ্গে ঘর্ষণে বাতাসের ঝড় তুলে, রৌদ্রের অগ্নিকণা গায়ে মেখে, সময়ের বুকে সময় ভাঙতে ভাঙতে সহস্র মনুষ্যবাহী বৈদ্যুতিক গাড়ি বিদ্যুতের বেগে ছুটে যাচ্ছে…

শিবেন কান পাতল কি পাতল না তবু মনে হ'ল, ধাতব ইস্পাতের চাকায় চাকায় ইস্পাতের ঘর্ষণে ঘর্ষণে ঘূর্ণ্যমান সময়ের বুকে ক্রমাগত শব্দ ঠিকরে উঠছে, পারব, পারব কি; পারব, পারব কি; পারব, পারব কি……

ভয়ে আনন্দে উত্তেজনায় উদ্বেলিত অস্থির শিবেন সংশয় ও প্রত্যয়ের আবেগে গলতে গলতে অসংখ্য মানুষের ভিড়ে মানুষের মমতা ও উত্তাপে দাঁড়িয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগল!

মুক্তি চাই

মুক্তি চাই।

সকল রাজবন্দীর মুক্তি চাই।

ক্ষুব্ধ স্বদেশের কারান্তরালে নির্বাসিত, নির্যাতিত, জানা কি অজানা সকল রাজবন্দীর মুক্তি চাই। বিচারপ্রাপ্ত, বিচারাধীন কিংবা নির্বিচারে নিক্ষিপ্ত, স্বৈরশাসনের পাশবিক শিকার, হাতে বেড়ি, পায়ে বেড়ি, বদ্ধপ্রাচীর কাঁটাতারে ঘেরা সহস্র শরীর, সর্বঅঙ্গে ক্ষতচিহ্ন সর্বঅঙ্গে রক্তধারা—সকল বন্দীর মুক্তি চাই।

এখন এই দেশে, দেশময় ছড়ানো অসংখ্য অগণিত বন্দীশালায়, পুত্রকন্যাপ্রিয়পরিজনহত অগণিত বন্দী, সকলের মুক্তি চাই।

অবিলম্বে বিনাশর্তে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি চাই।

সকাল থেকেই সূর্য ওঠেনি। আকাশের কোণে কোণে মেঘ জমেছে। ধূসর তামাটে মেঘ, ক্বচিৎ কোথাও সিঁদুরের আভা। বাতাস স্তব্ধ। অসহ্য গুমোট গরম।

খুব সম্ভব ঝড় আসবে। সকালের বেতারে ও সংবাদপত্রে সে-রকম একটা আভাস দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিম উপসাগরের বুকে কোথাও গভীর নিম্ন-চাপের সৃষ্টি হয়েছে। পারাদ্বীপ থেকে ঘণ্টায় ষাট কিলোমিটার বেগে ছুটে আসছে ঘূর্ণিঝড়। গতিপথ পরিবর্তন না করলে সন্ধ্যার মুখেই আছড়ে পড়বে গাঙ্গেয় উপত্যকায়। সঙ্গে প্রবলবর্ষণের আশঙ্কা। ঝড় ও বৃষ্টি একত্রে এই শহর তোলপাড় করবে।

এমন দিনে বাড়ি থেকে বেরুতে হলে একটা বর্ষাতি কিংবা ছাতা চাই। তাতে জল মানলেও ঝড় অবশ্য মানবে না। তবু চাই।

সেই ছাতাটারই খোঁজ করছিলেন লাবণ্যপ্রভা।

সকালে ঘুম থেকে উঠে যথারীতি স্নান করেছেন। কেরোসিনের স্টোভে ডাল ভাত রেঁধেছেন। এখন তার খাওয়া-দাওয়া, শাড়ি-ব্লাউজ পরা সমস্তই সম্পূর্ণ। তিনি কাজে বেরুনোর জন্য প্রস্তুত। ছাতাটা কোথায় গেল! গতকাল কি স্কুলে নিয়ে গিয়েছিলেন? টিচার্সরুমে ফেলে এসেছেন? অথবা অন্য কোথাও?

কমবয়েসি যে মেয়েটি সকাল থেকে তাঁর বাসায় কাজকর্ম করে, তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুই দেখেছিস, হারামণি ?'

'কি মা ?'

'আমার ছাতাটা ? পাচ্ছি না তো ! দেখ্ তো মা, একটু খুঁজে দেখ্ তো—'

কোথায় দেখবে ! ঘরে থাকলে তো !

হয়ত স্কুলেই ফেলে এসেছেন। গতকাল কিংবা তারও আগের দিন। ট্রামে বাসে ছেড়ে আসাও বিচিত্র নয়। এসব জিনিসপত্র, দরকারি কি অদরকারি, কখন কোথায় যে ফেলে আসেন, গুঁজে রাখেন অথবা কাউকে দিয়ে আসেন— কিছু কি মনে রাখতে পারেন আজকাল ! তাঁর মনের মধ্যে সেই মনটাই আর নেই। এখন সবকিছুতেই বড় ভুল, বড় গোলমাল। সুমন, তাঁর গর্ভের সন্তান, তাঁর সকল স্নায়ুশিরাকে, তার স্মৃতিশক্তিকে একেবারে শিথিল করে দিয়ে গেছে।

এই তো সেদিনের কথা।

বাক্সবন্দী মুর্শিদাবাদী একটা সিল্কের শাড়ি মোড়ের মাথায় লণ্ড্রীতে দিয়ে এসেছিলেন তিনি। আঁচলে জরির কাজ করা রঙীন দামী শাড়ি। বিয়ের পর কিছুদিন পরেছিলেন। এখন ধুয়ে-টুয়ে ছোট ভাইয়ের বউকে দিয়ে আসার ইচ্ছা। নিজের তো আর কাজে লাগবে না।

লণ্ড্রীতে দিয়ে এলেন কিন্তু আনার কথা মনে নেই।

মাস দুই পরে দোকানের মালিক নিজেই নেমে এসে পথ রোধ করলে তাঁর, 'দিদি, আপনার সেই শাড়িটা—'

'কোন্ শাড়ি ?' লাবণ্যপ্রভা অবাক হলেন। তিনি তো সাদাজমি কালো-পাড়ের সাধারণ শাড়ি পরেন। বাড়ির ধোপা-ই কাচাকুচি করে সেসব। এত চমৎকার সাজানো-গোছানো লণ্ড্রীতে তাঁর কোন্ শাড়ি ? অনেকক্ষণ স্মৃতি হাতড়াতে হ'ল তাঁকে। তারপর মনে পড়ল, 'ও, হ্যাঁ ! সেই বেনারসীখানা—'

দোকানের মালিক শুধরে দিল, 'বেনারসী না তো, সিল্কের শাড়ি—'

লাবণ্যপ্রভা আরো অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন, 'ও হ্যাঁ ! মনে পড়েছে, নিয়ে যাব, কালই নিয়ে যাব !'

হাতঘড়িটা খারাপ হয়ে যাওয়ায় এক সহকর্মিণীর পরামর্শে এসপ্লানেডের এক নামী দোকানে দিয়েছিলেন সারাতে। তারপর রসিদটা যে কোথায় রাখলেন ! এ তো পাড়ার দোকান নয়, এখানে সুমনের মা বলে তাঁকে তো কেউ চেনে না !

রসিদটার জন্য অনেক খোঁজাখুঁজি করলেন লাবণ্য। তারপর নিষ্ফল হয়ে শুধুহাতেই গেলেন একদিন। ব্যস্ত দোকান, ভিড় লেগেই আছে। সুসজ্জিত

সুদর্শন মালিক যথেষ্ট ঝাঁঝালো গলায় বলল, 'ইমপসিবল! রোজ এক-দেড়শ ঘড়ি আসে রিপেয়ারিং-এর জন্য। আপনারটা কিভাবে চিনে বের করব? যান, রসিদটা খুঁজুন ভাল করে! ওটা চাই!'

মুখ কালো করে ফিরে এলেন লাবণ্যপ্রভা।

তারপর অনেক হাঁটাহাঁটি, অনেক সাক্ষীসাবুদ, অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে শেষ পর্যন্ত বিনা রসিদেই উদ্ধার করলেন।

মাত্র কিছুদিন আগে দাদারা একটা দলিল দিয়েছিলেন। তাঁদের পৈত্রিক জীর্ণ বসতবাড়িটার উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত দলিল। ভাইয়ে-ভাইয়ে গোলমাল বেঁধে ওঠায় ঘরগুলো ভাগাভাগি হবে। তাতে লাবণ্যপ্রভারও একটা সই লাগবে। স্বত্ব ছাড়ার সই। দলিলটা দিয়ে বড়দা বলেছিলেন, 'রেখে গেলাম, ভাল করে পড়ে সই করে রাখিস।'

আদালতের শীলমোহর-ছাপা সেই মূল্যবান দলিলটা কোথায় যে গুঁজে রাখলেন, কিংবা ফেলে এলেন লাবণ্যপ্রভা!

ক'দিন ঘোরাঘুরি করে বড়দা একদিন বেশ তিক্ত গলাতেই বললেন, 'তোর মতলবটা কি বল্ দেখি লাবণ্য? বাড়ির ভাগ চাস তুই?'

শুনে লজ্জিত আহত লাবণ্যপ্রভা ছাইয়ের মতো সাদা মুখ করে তাকালেন দাদার দিকে। গভীর ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়েই থাকলেন। তারপর রুদ্ধগলায় খুব ধীরে ধীরে বললেন, 'ওই ভাঙাবাড়ির আধখানা ঘরের ভাগ নিয়ে আমি কি করব দাদা? কার জন্য নেব?'

বড়দা খুব অপ্রস্তুত হয়ে তাড়াতাড়ি বললেন, 'থাক, থাক, লাবণ্য! আমি বরং আর একটা দলিল লিখিয়ে আনব। বল্ দেখি, সুমন কেমন আছে? কতদিন দেখিস নি তাকে? কোন্ জেলে আছে সে এখন?'

সেই সুমন!

তাঁর গর্ভের সন্তান, তাঁর রক্তের উত্তরাধিকার। বিশ বছর বয়সে যে জেলে ঢুকেছিল—আজ জেলে জেলেই যার বয়স সাতাশ। সেই সুমনই সবচেয়ে বড়ো সর্বনাশ করে গেছে লাবণ্যপ্রভার।

না-হলে লাবণ্যপ্রভার বয়স এখনও এমন কিছু নয় যে, সবকিছুতেই এত ভুলভ্রান্তি ঘটতে পারে। কিংবা এমনও নয় যে পরিপূর্ণ যৌবনকালে স্বামী হারানোর ফলে সাধ-আহ্লাদের ভরা-নদীতে হঠাৎ বড়োরকমের ধু ধু একটা চড়া জেগে ওঠায় তাঁর মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে। এসব শোকতাপ কিংবা দুঃখদারিদ্র্যের ঝড়ঝাপ্টা তিনি খুব কমসময়েই কাটিয়ে উঠেছেন। সত্যি কথা

বলতে কি, সেই কবে, কত বছর আগে, তিনি স্বামীকে হারিয়েছেন—এখন ভাল করে মনেই করতে পারেন না। মানুষটার চলাফেরা কথাবার্তা আচারআচরণ —এসব খুঁটিনাটি বিষয় দূরে থাক, তাপউত্তাপের সেইসব গাঢ় এবং নিবিড় দৃশ্য ও স্মৃতি যা কিনা ঘনিষ্ঠ সোহাগে শিহরিত সলজ্জ—লাবণ্যর কাছে সেসবও এখন পুরোপুরিই ঝাপসা।

শ্বশুরকুলে দেখাশুনার কেউ ছিল না, কিন্তু মাথার ওপর বাবা ছিলেন, মামারা ছিলেন। একবাক্যে সমস্বরে সকলেই বলেছিলেন, 'তুই শক্ত হ লাবণ্য। ওই শিশুদুটোর মুখ চেয়ে মনকে শক্ত করে বাঁধ।'

তিনি বেঁধেছিলেন। দু'বছরের মেয়ে ঝুমা আর পাঁচমাসের ছেলে সুমন এই দুইশিশুর মুখের দিকে তাকিয়ে মনকে কঠিন বাঁধনেই বেঁধেছিলেন। এমন কি, ঘরের দেয়ালে ওদের বাবার যে ছবিটা সুন্দর ফ্রেমে সকলের সহজ-দৃশ্য করে টাঙ্গানো ছিল, যেটা কিনা লাবণ্যকে পাশে রেখে বিয়ের কিছু পরে-পরেই তোলা, কিছুদিন পরে সেটাও নামিয়ে সযত্নে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন সেই স্টিলের ট্রাঙ্কটায় যার মধ্যে তাঁর বিয়ের বেনারসীখানার সঙ্গে টুকিটাকি কিছু গয়না, আর স্পষ্ট হস্তাক্ষরে মাত্র তিনখানা খামবন্ধ চিঠি পরমযত্নে সাজানো আছে, যার সবক'টারই শেষ হয়েছে এইরকম এক নির্লজ্জ ভাষায়: 'তোমার টোপা গাল আর মিষ্টি ঠোঁটদুটোতে আমার অনেক আদর, অনেক চুম্বন—'

ছবিটা সরানোয় মামীরা আপত্তি করেছিলেন। দাদারাও কিছু ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। কেননা সতী মেয়েরা স্বামীর স্মৃতি নিয়েই বেঁচে থাকে। সেই স্মৃতির একটা জীবন্ত দলিলে টান দেওয়ায় সম্ভবত তাদের সংস্কারের ঘরেও একটাকিছু আশঙ্কার ছায়াপাত ঘটেছিল। কিন্তু লাবণ্যপ্রভা বেশ জোর গলাতেই বলেছিলেন, 'ঝুমু-সুমুরা বড় হোক। তখন টাঙ্গানো যাবে। এখন ওদের মন খারাপ হবে। এটা ভাল না।'

আসলে শৈশব থেকেই অবুঝ দুই শিশুর মনে বড়রকমের কোনো শূন্যতা-বোধ যাতে না জন্মায়—তার জন্য সতর্ক হয়ে উঠেছিলেন তিনি। এবং এই সতর্কতাকে অসম্ভব মমতায়, কঠিন পরিশ্রমে রক্ষাও করেছেন। সে এক দীর্ঘ ইতিহাস। চারদিকের অভাব-দারিদ্র্য-অনুগ্রহ-অনুকম্পার মধ্যে দুই শিশুসহ এক তরুণী বিধবা-মাতার টিকে থাকার, অস্তিত্বরক্ষার ইতিহাস। তার প্রতিটি পদক্ষেপে লাবণ্যপ্রভার কোনো ক্লান্তি নেই, ভুল নেই, থেমে পড়ার, ভেঙে পড়ার আর্তি নেই। খুব সাবধানে, চুলচেরা হিসেব করে, সন্তর্পণে পা ফেলে একটু একটু করে এগিয়েছেন তিনি।

ছেলেমেয়েরা সামান্য বড় হতেই স্বেচ্ছায় সরে এসেছেন পরের সংসার

থেকে। বুদ্ধিমতী তিনি, বুঝেছেন, দরিদ্র মধ্যবিত্ত আত্মীয়ের সংসারে বোঝা হয়ে থাকলে নিজের অবস্থা যাই হোক্ ছেলেমেয়েরা কখনো মানুষ হয় না। নিজের কাছে নিজেরাই ক্রমশ ছোট হতে থাকে, অবাঞ্ছিত হতে থাকে। হীনমন্যতায় কুঁকড়ে ওঠে তাদের মন।

ফলে আলাদা বাসা, আলাদা সংসার। স্কুলের চাকরিও জুটিয়ে নিয়েছেন। বিয়ের সময় সেকেণ্ড ইয়ারে পড়তেন। স্বামী মরার পর নিজেই বইপত্র সংগ্রহ করে বি-এ পাশ করেছেন। নিজের পরিশ্রমে, নিজের উপার্জনে ভাঙা-সংসার পরিপাটি নিপুণতায় গুছিয়ে নিয়েছেন। একটু একটু করে ছেলেকে বড়ো করেছেন, একটু একটু করে মেয়েকে বড়ো করেছেন। সুমন কলেজে ঢুকেছে, মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন। কিংবা দিয়েছেন বলা ঠিক নয়—ঝুমু নিজের পাত্র নিজেই নির্বাচন করেছে। লাবণ্যপ্রভা খুব আপত্তি করেন নি। ভালবেসে বিয়ে কবার মধ্যে গুরুতর অন্যায় কিছু আছে এমন মনে করার মতো মানসিক গঠন আর তাঁর নেই। দীর্ঘকাল স্কুলে চাকরি করে, বাইরের জগতের মানুষজনের সঙ্গে মেলামেশা করে, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জীবিকাগত নানা আন্দোলনে বাধ্যত জড়িয়ে পড়ে—মনের বহু জড়তা, বহু সংস্কার কাটিয়ে উঠেছেন তিনি। কোন্ সুদূরকালে অপরিচিত একজনের নম্র-নরম ঘোমটা-টানা বউ হয়ে সংসারে ঢুকেছিলেন, সেই স্বপ্ন হারিয়ে যেতেই দুটি শিশুর মা হয়ে বাঁচতে চাইলেন. এখন বাইরের জটিল আবর্তময় কর্মজগতে পা দিয়ে তিনি আর এক স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বেরও অধিকারী।

তাছাড়া জাতগোত্রের প্রশ্নে বিয়েতে যদি-বা সামান্য আপত্তি ছিল, সুমনের জন্য সেটা একটুও দানা বাঁধতে পারে নি। ওই এতটুকু ছেলে, গোঁফের রেখা তখনো স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি, ঘন কালো চুল, উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি—মা-র সঙ্গে এমন তর্ক বাঁধিয়ে বসল যেন হিন্দুসমাজের জাত-পাতের নাড়ীনক্ষত্র আর ভালবাসাবাসির সমস্ত রহস্যই তার জানা হয়ে গেছে, যেন এই সংসারের আয়-ব্যয়-সামর্থ্যের সমস্ত হিসাবও তার নখদর্পণে, যেন সবকিছুর শেষসিদ্ধান্ত নেবার দায়দায়িত্ব তারই, এই সংসারের সে-ই যেন অভিভাবক। দুর্বিনীত নয় কিন্তু দৃঢ়। অসহিষ্ণু নয় কিন্তু অবিচল। বয়সের তুলনায় কথায় যুক্তি ও চিন্তার ধার অনেক বেশী। লাবণ্যপ্রভা তার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারলেন না। ছেলের যুক্তি মেনে নিয়ে বুঝলেন, যাদের অর্থবল নেই তাদের মনোবল বেশী থাকা দরকার। আর ছেলেটি যখন সমস্ত দিক দিয়েই যোগ্য, যথেষ্ট শিক্ষিত এবং উপার্জনশীল তখন জাতবর্ণের মিল হ'ল না বলে দু'হাতের মিলকে আটকানো যায় না!

সুমনের কাছে পুরোপুরি হার মানলেন লাবণ্য। যেন বিনীত বাধ্য মেয়ের মতো সংসারে পুত্রের অভিভাবকত্ব মেনে নিলেন! নিজের অজ্ঞাতসারেই এক অদ্ভুত স্বস্তি ও নিরাপত্তার আশ্বাসে তাঁর বুক ভরে উঠল। সুমন বড়ো হয়ে উঠেছে। দায়দায়িত্ব নেবার মতো বিদ্যাবুদ্ধি হয়েছে। সংসারের সুখদুঃখ ভাবঅভাব, খুঁটিনাটি কত কি নিয়ে, কত গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে শিখেছে। লাবণ্য এবার নিশ্চিন্তে নিজের জন্য একটু বিশ্রামের কথা ভাবতে পারেন। নির্ভরতার একটা আশ্রয় পেয়ে গেছেন বলে এখন একটু অবসরের ছুটিতে যেতে পারেন—

ছেলের কাছে হার মেনেও আনন্দে যেন চোখে জল এসে গেল লাবণ্যপ্রভার।

ঠিক তার কিছু পরেই আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের বিশাল লোহার দরজা কর্কশশব্দে দু'ভাগ হয়ে কদর্য এক হাঙরের হাঁ-মুখের আকার নিয়ে গ্রাস করল সুমনকে—

আকাশে মেঘ ডেকে উঠল।

গর্ গর্ শব্দটা প্রবল সিংহগর্জনের মত। ক্রমশ আলো আরো ম্লান হয়ে বিষণ্ণ ছায়াময় একটা অন্ধকার ঘনিয়ে এল।

হারামণির বাসনকোসন মাজা হয়ে গেছে। যাবার আগে আঁচলে হাত মুছতে মুছতে বলল, 'আজ আর কাজে যেও নি মা।'

লাবণ্য তার মুখ দেখলেন। নিষেধের অর্থও বুঝলেন। তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'জলঝড় আসতে দেরী আছে, তার আগেই পৌঁছে যাব।'

হারামণি বলল, 'যাবে তো, ফিরতি পারবে নি।'

লাবণ্যপ্রভা হাসলেন, 'ঠিক ফিরে আসব!'

কথাটা বলে নিজের ভেতর নিজেই যেন কেঁপে উঠলেন! কিছু একটা যেন চকিতে মনে পড়ে গেল তাঁর। গভীর নির্জন রাতে দূরাগত, প্রায়-নক্ষত্রলোক থেকে ভেসে-আসা অস্পষ্ট অস্ফুট গুঞ্জনধ্বনির মতো একটা কণ্ঠস্বর যেন শুনতে পেলেন তিনি, 'তুমি কিছু ভেবো না মা, আমি ঠিক ফিরে আসব—'

সে বলেছিল, সুমন, তাঁর গর্ভের সন্তান, সাতবছর আগে এক ভোররাতের আলো-অন্ধকারে, এই বাড়ি থেকে শেষবারের মতো বেরিয়ে যাবার সময়!

সে ফেরে নি।

এই রাজ্যের জেলখানা থেকে জীবিত অবস্থায় আর কখনো ফিরবে কিনা

কেউ জানে না—

একটা প্রবল দীর্ঘশ্বাস বুকের ভাঁজে গোপন করলেন লাবণ্যপ্রভা। তাঁর ভয় কি! সামান্য জলেঝড়ে তাঁর কি হবে! এই শূন্যঘরে তিনি আবার ঠিক ফিরে আসবেন।

দরজায় তালাবন্ধ করে ভাড়াবাড়ির বারোয়ারী উঠোন পার হয়ে গলিতে নামলেন। নেমেই মনে হ'ল, ঘরের সুইচ্‌গুলো সব কি অফ্ করেছেন? একটু আগেই লোড্‌শেডিং হয়েছে। তখন ঘরে একটা বাতি জ্বলছিল, পাখাও ঘুরছিল। যদি অফ্ না করে থাকেন তাহলে দুপুরের দিকে হঠাৎ কারেন্ট এসে গেলে—

আবার ফিরলেন লাবণ্য। সুইচ্‌গুলো অফ্ করতে গিয়ে দেখলেন, স্টোভের একটা পলতে জ্বলছে মিটমিট করে। ফুঁ দিয়ে নেভালেন। তারপর দরজায় ফের তালাবন্ধ করতে গিয়ে ভাবলেন, সংসারে একটা ঝিনুকের বোতাম কি একটা চুলের কাঁটাও যার দৃষ্টি থেকে কখনো হারিয়ে যায় নি, আজ অনায়াসে ছোটবড় কত ভুলই না তিনি করে বসেন!

লাবণ্য বড়রাস্তায় নামতে আকাশের মুখ আরও কালো হ'ল। সেই গুমোট গরম আর নেই। এলোমেলো বাতাস বইছে। সম্ভবত কাছাকাছি কোথাও বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে। আসন্ন ঝড় ও বর্ষণের আশঙ্কায় রাস্তাঘাট একটু যেন ফাঁকা-ফাঁকা। অবশ্য ট্রামেবাসে অফিসযাত্রীদের ঝুলন্ত ভিড় সমানই আছে।

ইচ্ছে করলে লাবণ্য ছুটি নিতে পারতেন—ক্যাজুয়েল লিভ ডিউ টু ইন্‌ক্লিমেণ্ট ওয়েদার, কিংবা অন্য কারণে। কিন্তু ছুটি নিয়ে কি করবেন? নিজের বদ্ধঘরের অন্ধকারে বসে আসন্ন ঘূর্ণীঝড়ের প্রহর গুনবেন? আকাশ-ভেঙে নেমে-আসা দুরন্ত-বর্ষার শব্দ শুনবেন? না কি জলেঝড়ে এই মহানগরের আকাশবাতাস কেমন তোলপাড় হয়—সেই ভয়ঙ্কর সুন্দর দৃশ্য দেখবেন? এসব দেখার মত মনের অবস্থা কি তাঁর আছে? বরং এখন, এইসব অস্বাভাবিক দিনগুলিতে ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে একাকী নির্জনে বদ্ধ হয়ে থাকতেই ভয় করে লাবণ্যপ্রভার। শরীরে কাঁটা দেওয়া ভীষণ এক অস্বস্তিকর ভয়। কোথা থেকে যেন লোমশ কপিশবর্ণ চক্রান্তের-অদৃশ্য একটা বেড়াজাল চারপাশে ছড়িয়ে গিয়ে ক্রমশ ছোট হতে হতে তাঁকে জড়িয়ে ফেলতে চায়। একটা পাণ্ডুর আতঙ্কে তাঁর সমস্ত বোধঅনুভূতিচৈতন্য দুর্বল ও ভঙ্গুর হয়ে কাঁপতে থাকে। কেন জানি তাঁর কেবলই মনে হয়, এইসব দিনে অথবা দিনের চেয়েও ভয়ংকর এইরকম রাত্রিগুলোতে, যখন আকাশে মেঘের ঘনঘোর ঘটা, বাতাসে কড়্ কড়্

বাজের শব্দ, আগুনের ঝাপটার মত বিদ্যুতের তীব্র ঝলকানি, ঝড় ছুটে বেড়াচ্ছে ক্ষিপ্ত বেগে আর অবিরাম বর্ষণে ডুবে যাচ্ছে ধরিত্রী—তখন প্রকৃতির এই অস্বাভাবিক প্রলয়কালে, ঝড় ও বর্ষণের এই উন্মত্ত অট্টনৃত্যের মধ্যে—তারা সব দল বেঁধে শিকার খুঁজতে বেরিয়ে পড়ে। বিশ্বের বৃহত্তম মহত্তম গণতন্ত্রের এই বধ্যভূমিতে মানুষের হৃদপিণ্ড শিকার! কেননা এই-ই তো সময়! চমৎকার নিরাপদ সময়, নেকড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ার, শৃগালের মতো ছিঁড়ে খাবার, কুকুরের মতো মাংস নিয়ে টানাটানি করার! এখন, এই দেশে, ওইসব প্রাচীরবদ্ধ জেলখানার নিরন্ধ্র অন্ধকারে—

আসলে এখন, এইরকম সব ভয়ানক বিপর্যস্ত মুহূর্তে, সুমনের মা লাবণ্যপ্রভা কারান্তরালে বন্দীহত্যার কথা ভাবেন।

আর ভাবনাটা অবান্তরও নয়। সুমন জেলে যাওয়ার পর থেকে এই সাত বছরে এই রাজ্যের জেলখানাগুলোতে একটার পর একটা বন্দীহত্যার ঘটনা কতই তো ঘটল! আজ কলকাতায়, কাল হাওড়ায়, পরশু বহরমপুরে—

আজ দশজন, কাল পনেরোজন, পরশু আঠারোজন—

নিরস্ত্র অসহায় বিচারাধীন বন্দীহত্যা!

বর্বরতার সেই সংবাদ সকালে বহন করে এনেছে সংবাদপত্র। মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে তার বিবরণ। হতাহতের তালিকায় নাম দেখতে দেখতে শরীরের সমস্ত রক্ত বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে লাবণ্যপ্রভার। চোখের দৃষ্টি অন্ধ হয়ে ঘরবাড়িআলোবাতাসসহ কাগজের গোটা পাতাটাই ঘন কালি-লেপা হয়ে উঠেছে। দম আটকানো একটা কষ্ট আর দ্রুততালে লাফিয়ে-চলা হৃদপিণ্ড নিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে চিৎকার করে উঠতে চেয়েছেন তিনি, 'সুমন......আমার সুমন......'

রাজ্যজুড়ে চারপাশে প্রতিরাতে খুন, প্রতিরাতে হত্যা আর পুলিশ-মিলিটারির প্রাত্যহিক চক্রবদ্ধ কুম্বিং-এর মধ্যে জেলখানায় এই বন্দীহত্যার ব্যাপারটাই দিনের পর দিন তাঁর স্নায়ুর উপর অসম্ভব চাপ সৃষ্টি করেছে। মনের জোর নিঃশেষে শুষে নিয়ে তাঁকে এক স্নায়বিক-দৌর্বল্যের রুগীতে পরিণত করেছে। এখন কত সামান্য বস্তু থেকে কত অসামান্য ঘটনাই যে কল্পনা করে নেন তিনি! তারপর নিজের কল্পিত ঘটনার আবর্তে অসহায়ের মতো ঘুরপাক খেতে খেতে ক্রমশই ভয়বেদনাবিমর্ষতার গভীরে তলিয়ে যেতে থাকেন। তাঁর কেবলই মনে হয়, যে-কোনো দিন, যে-কোনো মুহূর্তে সুমনের মৃত্যুসংবাদ তাঁর কাছে পৌঁছুতে পারে। কেননা যে-দেশের বদ্ধকারাগারে শৃঙ্খলিত বিচারাধীন অসহায় নিরস্ত্র বন্দীদের অকারণেই গুলি করে হত্যা করা

হয়, সেই দেশের সেইসব জেলখানায় তাঁর সুমনের আয়ু কতদিন ! কে বলতে পারে, আজ রাতই তার সাতাশ বছরের জীবনের শেষরাত কিনা !

এখন গভীররাতে আগুন নেভানোর জন্য দমকলের গাড়ি ছুটে গেলে তার ঢং ঢং ঘণ্টার শব্দে ঘুম ভেঙ্গে বিছানায় উঠে বসেন লাবণ্যপ্রভা। তাঁর হাত পা শরীর হঠাৎ-ই এমন অবশ হয়ে যায় যে, সুইচ টিপে আলো জ্বালানোর সাহসটুকু পর্যন্ত হয় না। অন্ধকারে সেই ভয়ংকর শব্দ আদিগন্ত গ্রাস করে হা-হা রবে যেন তাঁর দিকেই ছুটে আসে। তাঁর কেবলই মনে হয়, কাছেই কোথাও কোনো-এক জেলখানায় একটানা অবিরাম পাগলাঘণ্টা বাজছে, তার কর্কশ কঠোর শব্দের ধাতব হিংস্রতায় আকাশ চিরে যাচ্ছে, জেলখানার শানবাঁধানো চত্বরে লোহার নাল-আঁটা ভারি বুটগুলো মত্ত তাণ্ডবে দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে, দ্বিমুখী বন্দুকের মসৃণ নল আর ইস্পাতি বেয়নেটের ছুঁচলো ডগা অন্ধকারে বাঘের চোখের মতো ঝলসে উঠছে—আর ভয়ার্ত সন্ত্রস্ত যত কারাবন্দী সদ্য ঘুমভাঙা চোখের স্তম্ভিতবিস্ময়ে খরসান এক আক্রমণকে অকস্মাৎ মুখোমুখি দেখে আত্মরক্ষার আদিম তাগিদে বন্ধঘরের এ-কোণ থেকে ও-কোণে আগুন-লাগা বাড়ির খাঁচারুদ্ধ-পাখির মতো ডানা ঝাপটে ডানা ঝাপটে ডানা ঝাপটে অস্তিত্বের অন্তিম আর্তনাদ প্রবল ঘৃণায় উচ্চারণ করছে ! এর মধ্যে সে-ও তো আছে—তাঁর গর্ভের সন্তান ! পিতৃহীন যে শিশুকে আপন রক্তে-ঘামে-শ্রমে-স্নেহে দীর্ঘকাল বড়ো করে তুলেছেন একটু একটু করে, সেই সুমন—

দমকলের ঘণ্টা আর শোনা যায় না, কিন্তু নিচ্ছিদ্র অন্ধকারে এক স্বামী-হীনা প্রৌঢ়া জননীর বিবর্ণ ভয়ার্ত কম্পমান চেতনায় জেলখানার পাগলাঘণ্টা প্রবল হিংস্রতায় সারারাত বিরামবিহীন বাজতেই থাকে, বাজতেই থাকে……

নিঃসঙ্গ ঘর এখন অসহ্য মনে হয় লাবণ্যপ্রভার। মনে হয় ঘরের এই আবদ্ধ নির্জনতার বাইরে বিশাল এই দেশে, এই ভূখণ্ডে, সুমনের বিরুদ্ধে সর্বত্রই নিঃশব্দে একটা গভীর চক্রান্ত চলছে। ঘরে বসে থাকলে তার কিছুই তিনি ধরতে পারবেন না। জানতেও পারবেন না, তাঁর বিশ বছরের হতভাগ্য ছেলেটা জেলে জেলেই যার বয়স এখন সাতাশ, গতরাতে অথবা আজ সকালেই কেমন করে এই স্বাধীন রাজ্যে অধিকতর স্বাধীন এক পুলিশীব্যবস্থার হাতে জীবনের শেষ মার খেতে খেতে তালগোল পাকিয়ে একটা মাংসপিণ্ডের আকার নিয়ে হঠাৎ নিঃশব্দে চিরকালের মতো মরে গেল।

লাবণ্যপ্রভা এখন বাইরে থাকতেই ভালবাসেন। কেননা বাইরে অনেক মানুষজন দেখা যায়। মানুষের চলমান জীবনস্রোতের মধ্যে অনেক সংবাদ, অনেক উত্তাপ, অনেক সাহস খুঁজে পাওয়া যায়। মানুষই তো মানুষকে

বাঁচিয়ে রাখে, জড়িয়ে-ছড়িয়ে, ঘিরে রাখে। মহানগরীর ধাবমান লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে নেমে লাবণ্যপ্রভার মনে অদ্ভুত এক আত্মবিশ্বাস জন্মায়। এই তো শহরের সবকিছু ঠিকমতো চলছে, ট্রামবাস-গাড়িঘোড়া ছুটোছুটি করছে, রঙবেরঙের পোষাক পরা বাচ্চারা স্কুলে যাচ্ছে, সুমনের বয়সী ছেলেরা এখনও নিরুদ্বেগে এই শহরের পথেঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে, গল্পগুজব জটলা করছে। এত মানুষ, এত শিশু, এত যুবক স্বাভাবিক ভাবে এখনও বেঁচে আছে শহরে! লাবণ্যপ্রভা চোখ ভরে দেখেন। বেঁচে-থাকা মানুষের মধ্য থেকে যেন তিনি সুমনের বেঁচে-থাকার বিশ্বাসটুকুকেও কুড়িয়ে নিতে চান। জীবন থেকে জীবনের আশ্বাস সংগ্রহ করেন।

এইজন্যই আসন্ন জলঝড়ের প্রবল আশঙ্কাও তাঁকে ঘরে রাখতে পারল না। স্কুলে যাবেন বলে একটা দোতলা বাসের ভিড়ের মধ্যে প্রতিদিনের অভ্যাসমতো নিজের শরীর গলিয়ে দিলেন। তারপর পায়ে পায়ে এগুলেন লেডিসসীটের দিকে। অনেকখানি পথ যেতে হবে।

ছেলে জেলে আছে এ-সংবাদ স্কুলের সকলে জানে কিনা—লাবণ্যপ্রভা জানেন না। অন্তত এ নিয়ে কেউ কোনোদিন তাঁকে প্রশ্ন করে নি। স্কুলটা অনেক দূরে, শিক্ষিকারাও নানা জায়গা থেকে জড়ো হন। সাধারণভাবে অভাব অভিযোগের কথা হয়, জিনিসপত্রের দরদাম নিয়ে আলোচনা চলে, কিছু কিছু রাজনীতির কথাও ওঠে, কিন্তু কার ছেলে ভাই বোন জেল খাটছে—এ প্রসঙ্গ কেউ তোলে না। স্কুলের আবহাওয়াটাও তেমন ভাল না। ম্যানেজিং কমিটির যিনি সভাপতি তিনি নিজে রাজনীতি করেন এবং সেই বিশেষ রাজনীতি ছাড়া অন্য রাজনীতির আলাপ-আলোচনা একেবারেই অপছন্দ করেন। তার উপর এখন জরুরী অবস্থা। টীচার্সরুমে ভয়ে কেউ মুখ খোলে না। কেউ কাউকে তেমন বিশ্বাসও করতে চায় না। এখন এখানে, স্কুলের ঘর-বারান্দা টিচার্সরুমে, নিরাপদে ও নির্ভয়ে যথেষ্ট চিৎকার করে শুধু একজনের কথাই আলোচনা করা যায়—তিনি এশিয়ার মুক্তিসূর্য, তিনিই ভারত, ঢ্যাট ইজ ইণ্ডিয়া—

লাবণ্যপ্রভা রাজনীতি করেন না। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আন্দোলনের বাইরে কোনোকিছুর সঙ্গে তাঁর যোগ নেই। রাজনীতির আঁকসন্ধি, নানা তত্ত্বের লড়াই, নানা মতের পার্থক্য—এসব তাঁর অভিজ্ঞতার বাইরে। তবে এখন এটুকু বোঝেন, তাঁর ছেলে সুমন এক অসম্ভবের নেশায় মেতেছিল, এক জীবনপণ মরণঝুঁকির খেলায় নেমেছিল। 'আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বৈধ সরকার'-এর শাসনযন্ত্রের মূল ধরে টান দিতে চেয়েছিল, পুরনো গাছের শিকড় উপড়ে নতুন গাছের চারা পুঁততে চেয়েছিল। এ এক বিপজ্জনক, বে-আইনী, ভয়ঙ্কর

কাজ!

গোপনে গোপনে সে যে এরকম আত্মঘাতী খেলায় মেতেছে—মা হয়েও টের পান নি লাবণ্যপ্রভা। যখন পেলেন তখন সর্বনাশ শিয়রে এবং 'আবার ফিরে আসব' বলে সুমনও উধাও! আর তার খোঁজ পেলেন না লাবণ্য কিন্তু তার খোঁজে ঘন ঘন পুলিশ আসতে লাগল বাড়িতে। কখনো দিনে, কখনো রাতে, কখনো সাদা পোষাকে, কখনো সশস্ত্র ইউনিফর্মে। উলটপালট করে বাড়ি সার্চ হতে লাগল। সুমনের মা হওয়ার অপরাধে লাবণ্যপ্রভাকে ঘন ঘন ডাকা হতে লাগল থানায়। তারপর একদিন বিষণ্ণ, চিন্তাক্লিষ্ট ভয়কাতর এই জননীকে এমন কথাও শুনতে হ'ল, 'আর সাতদিনের মধ্যে ছেলের খোঁজ না দিতে পারলে, ধাড়ি মাগী, তোকেই ভরে দেব হাজতে!'

ভাষা শুনে পঞ্চাশ উত্তীর্ণা শিক্ষিকা লাবণ্যপ্রভা স্তম্ভিত হলেন।

মনে পড়ল, শেষের দিকে তাঁর ছেলে সুমন অস্থির অধৈর্য গলায় প্রায়ই বলত, 'মা, এইদেশে এখন আমরা একটা পুলিশীখাঁচার মধ্যে ইঁদুরের মতো বাস করি ইঁদুরের মতো চলাফেরা করি—'

লাবণ্যপ্রভার আরো মনে পড়ল, তাঁর বিশ বছরের পাতলা-গড়ন, ঝাঁকড়া-চুল, উত্তেজিত-মুখ আর উজ্জ্বল-চোখের ছেলে আরো বলত, 'মা' আমাদের অভাব, আমাদের কষ্ট এসব যদি দূর করতে হয়, ঘরে-বাইরে মানুষের সম্মান নিয়ে যদি বাঁচতে হয়, তাহলে এ রাষ্ট্রব্যবস্থা পাল্টাতেই হবে মা!'

থানা থেকে নিঃশব্দে উঠে এসেছিলেন লাবণ্যপ্রভা। কিন্তু অসংশয়ে সেদিনই বুঝেছিলেন, আইনের চোখে সুমনের অপরাধ কত গুরুতর, তার উপর এই রাষ্ট্রযন্ত্রের আক্রোশ কত বেশী!

তারপর থেকে ছেলের বিষয়ে আর মুখ খোলেন না তিনি। এখানে-ওখানে খোঁজ করাও বন্ধ করলেন। যদি কেউ কোনো সূত্র পেয়ে যায়! সাদা পোষাকে পুলিশ সবসময়ই অনুসরণ করে তাঁকে, এমন কি স্কুলের দরজা পর্যন্ত। আগুন নিয়ে যে ছেলে খেলতে নেমেছে তার গণগণে আঁচের হাত থেকে মা হয়ে তিনি কি রেহাই পেতে পারেন। 'বিপজ্জনক ছেলের মা-ও বিপজ্জনক'—এই সাধারণ বুদ্ধি থেকেই স্কুলেও কারো কাছে কখনো মুখ খোলেন নি তিনি। এতে তাঁর চাকরির ক্ষতিও হতে পারে। সুমন ধরা পড়ার পর একটা বাংলা কাগজে অন্য অনেকের সঙ্গে তার নাম বেরিয়েছিল। স্কুলের একজন জিজ্ঞেস করে-ছিলেন, 'লাবণ্যদি, তোমার ছেলের নাম সুমন না?'

লাবণ্যপ্রভা উত্তর দিয়েছিলেন, 'হ্যাঁ। কিন্তু সে তো এখন ওর দিদির কাছে—এলাহাবাদে আছে।'

তবু কথাটা একেবারে গোপনও থাকেনি। অন্তত একজন সব খবরই জেনে-ছিলেন। তিনি স্কুলের বনবিহারীবাবু—

মেয়েদের এই স্কুলটায় বনবিহারী সবচেয়ে পুরনো লোক, কেরানী কাম্ এ্যাকাউনটেণ্ট কাম্ টাইপিস্ট। অনেকদূর থেকে যাতায়াত করেন। ত্রিশটাকা বেতনে ঢুকেছিলেন। এখন ষাটের কাছাকাছি বয়সে মাইনে পান একশ চল্লিশ টাকা। জুনিয়র স্কুল ধাপে ধাপে হাই স্কুল হয়েছে, বনবিহারীব বেতনও একটু একটু করে বেড়েছে। বাড়ার অনুপাতটা এত কম কেন এ প্রশ্ন করার অধিকার বনবিহারীর নেই, কেননা, একে তিনি সে আমলের নন্-ম্যাট্রিক. তার উপর কোনোকালেই স্কুল কমিটির সুনজরে নেই।

লম্বা রোগা চেহারা, তোবড়ানো গাল, ছোট করে ছাঁটা মাথার কাঁচা-পাকা চুলগুলো সবসময় বুরুশের মত খাড়া হয়ে থাকে, ছেঁড়া জামা, ময়লা ধুতি—মানুষটাকে দেখলেই মায়া হয়। সকাল থেকে সন্ধ্যা—শুধু চাকরিটুকু বাঁচানোর জন্য স্কুলে কঠোর পরিশ্রম করতে হয় তাকে। অথচ ধমক-ধামকও সবচেয়ে বেশী খেতে হয় তাঁকেই।

এই বৃদ্ধ ছা-পোষা বনবিহারীবাবুই একবার চুপিচুপি বলেছিলেন, 'দিদি, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

নীচের অফিসঘর তখন ফাঁকা। একা বনবিহারী মোটা খাতায় হিসেবের কাজ করছেন। তাব মাথার উপর একটা ঝুলন্ত বাল্ব জ্বলছে এবং তার পাশেই দেয়ালে জরুরী অবস্থার পোস্টার সাঁটা—'কঠোর পরিশ্রমের কোনো বিকল্প নেই।'

প্রবিডেণ্ড ফাণ্ডের টাকাব বিষয়ে কি একটা জানতে এসেছিলেন লাবণ্য, বনবিহারীর প্রশ্নের ধরনে সামান্য অবাক হলেন, 'কি কথা?'

বনবিহারীবাবু গলা লম্বা করে ঘর-বারান্দার চারদিক ভাল করে দেখে নিয়ে বললেন, 'আপনার ছেলে কোন্ জেলে আছে দিদি?'

প্রশ্ন শুনে চকিত হয়ে উঠলেন লাবণ্য। মুখের রেখা কঠিন ও চোখের দৃষ্টি সন্দেহে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। বনবিহারী অপলকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সে মুখের ভাষা বুঝলেন। গলার স্বর আরো খাদে নামিয়ে বললেন, 'না দিদি, ভয় নেই! আমার মেজ ছেলেটা আজ পাঁচ বছর জেলে—'

শোনামাত্র প্রবলভাবে চমকে উঠলেন লাবণ্য। তার মুখের রেখা নরম আর চোখের দৃষ্টি বিবর্ণ হয়ে গেল। অসহায়ের মতো চোখ বড়ো করে তিনি বুড়োমানুষটার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

বনবিহারী শুষ্ক চুপসানো মুখে বললেন, 'আমার দুঃখ আপনি বুঝবেন

দিদি! এখানে আর কাকে কি বলব! জানতে পারলে আজই চাকরি খেয়ে নেবে। কর্তারা সব তো মহারাণীর পা-চাটা গোলাম। আমি সব জানি, সব বুঝি! ছেলেটা পাঁচ বছর জেলে, খেতে দেয় না, পরতে দেয় না, রোগে-ব্যারামে একফোঁটা ওষুধ দেয় না, আর মারধোর, সে তো আছেই! বছর দুই আগে একবার সদরের কোর্টে হাজির করেছিল। তারপর আইন পাল্টে কি যে আইন হ'ল এখন আর আদালতও নেই, বিচারও নেই—'

কাজের কথা ভুলে লাবণ্য ক্ষীণ গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কি করেছিল আপনার ছেলে?'

'সে কি আমি জানি ছাই! পুলিশ তো একগাদা কেস্ সাজিয়েছে, মার্ডার থেকে স্মাগলিং কিছুই বাদ রাখে নি'···, বনবিহারীর গলা একটু যেন ক্ষুব্ধ, উত্তেজিত, কিন্তু তারপরেই সামলে নিলেন তিনি, স্বর আবার খাদে নামিয়ে বললেন, 'আসলে কি জানেন? অনেক কষ্টে একটা কাঁচের ফ্যাক্টরিতে ঢুকিয়ে-ছিলাম। সেখানে ইউনিয়ন-টিউনিয়ন করত। ওই লালঝাণ্ডার ইউনিয়ন। তারপর স্ট্রাইক শুরু হ'ল। স্ট্রাইক ভাঙতে হামলাবাজি। পুলিশের গাড়ি পেছনে রেখে একপক্ষ ছুরিবোমাপিস্তল বার করল। আরেকপক্ষ কি চুপ করে থাকবে? বাঁচা-মরার লড়াই! এই নিয়েই কি যে গোলমাল পাকাল! মাঝখান থেকে তুলে নিয়ে গেল শিবুকে!······ওই ছেলেটাই যা-হোক একটু মানুষ হয়েছিল, দু-চার পয়সা দিত, সংসারটাও একটু দেখত। বাড়িতে সাতটা মুখ। আমি আর ক'টাকা মাইনে পাই?······পাঁচ বছর ভরে রেখেছে, কতদিন যে দেখি নি দিদি! কে জানে কেমন আছে আজকাল—'

শেষের দিকে বনবিহারীর গলা ধরে এল। গর্তে ঢোকা চোখদুটো একটু ঝাপসা হয়ে উঠল যেন।

লাবণ্যপ্রভার স্নায়ুগুলো কেমন দুর্বল হয়ে পড়ল। তারও বুকের মধ্যে কাঁপুনি শুরু হয়ে গেল। তিনিও তো দেখেন নি! কতদিন দেখেন নি ছেলেকে। কে জানে কেমন আছে। কতটুকু সুস্থ আছে—

লাবণ্যপ্রভার বুকের গভীরে একটা শব্দ অস্ফুটে উচ্চারিত হতে লাগল, 'সুমন···আমার সুমন······'

লাবণ্যপ্রভা যখন স্কুলে এসে পৌঁছুলেন তখন বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, ঝোড়ো বাতাস বইছে, আকাশের মেঘ ঘন কালো হয়ে চরাচর আরো অন্ধকার করে তুলেছে। দুপুরের শুরুতেই এখন সন্ধ্যার ঘোমটা-টানা।

এমন দিনে কে আসে স্কুলে!

জলের ছাটে লাবণ্যপ্রভা সামান্য ভিজে গিয়েছিলেন। শাড়ির আঁচলে মুখ মুছতে মুছতে বারান্দা ধরে সিঁড়ির দিকে এগুলেন। দু'চারজন উঁচুক্লাসের ছাত্রী ছাড়া তেমন কাউকে দেখতে পেলেন না।

শুধু সিঁড়ি-ঘেঁষা অফিস-ঘরটায় বনবিহারীবাবুকে দেখলেন। সেই পানি-হাটি নাকি মধ্যমগ্রাম, কোন্ জায়গা থেকে যেন আসেন মানুষটা। আজও ঠিক এসে গেছেন। মাথার উপর বাতি জ্বালিয়ে চেয়ারে উবু হয়ে বসে, মনে হয়, খবরের কাগজ দেখছেন। জলেভেজা ঝড়োকাকের মতো তাঁর শীর্ণ শরীরের আধখানা দেখতে দেখতে লাবণ্য উপরে উঠে এলেন।

হেড্‌মিস্‌ট্রেস নিজেই আসেন নি। এ্যাসিস্টেন্ট হেড্‌মিস্‌ট্রেসের চার্জে আছেন কমলাদি। ভিজতে ভিজতে এসেই বললেন, 'আজ কি স্কুল হয়! ছুটির ঘণ্টা বাজিয়ে দাও!'

টিফিনের আগেই স্কুল ছুটি হয়ে গেল। কাছাকাছি থাকেন এমন দু'চারজন শিক্ষিকা যারা এসেছিলেন, তাঁরা লাবণ্যপ্রভার জন্য দুশ্চিন্তা প্রকাশ করলেন। এমন দিনে এত দূর থেকে তিনি কেন এসেছেন, কিভাবে ফিরবেন, ফিরতে হলে এখুনি বেরিয়ে পড়া দরকার, এরপর ট্রামবাস কি চালু থাকবে—বলতে বলতে একে একে চলে গেলেন।

এখন বড় টিচার্সরুমটায় লাবণ্যপ্রভা একা। সারি সারি ক'টা চেয়ার, মস্ত লম্বা টেবিল, গোল-করে-গোটানো মানচিত্র-সমেত একটা স্ট্যাণ্ড, বইয়ের আলমারি, দেয়ালে সুভাষ নেহেরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ইন্দিরা গান্ধীর আধ-খানা-ঘোমটা-টানা হাসি-মুখের ছবি, ছবির ঠিক নীচেই কাঠের বোর্ডে পিন্‌আপ করা দেশ দ্রুত সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলার মস্ত বড় একটা বিজ্ঞাপন...... এইসব কিছুর মাঝখানে এখন লাবণ্যপ্রভা একেবারে নিঃসঙ্গ একা .....

অসহায়ভাবে চারদিকে তাকিয়ে ছাতাটার খোঁজ করলেন। ভুল করে ফেলে গিয়ে থাকলে সুভাষী তুলে রাখবে। সে টিচার্সরুমের পরিচারিকা। কিন্তু আজ সে-ও এব্‌সেন্ট। লাবণ্যপ্রভা নিজেই খুঁজবেন বলে একটা আলমারির দিকে এগিয়ে গেলেন। আর ঠিক তখুনি, সমস্ত চরাচর কম্পিত করে ভীষণ শব্দে একটা বাজ পড়ল। শব্দটা এমন কুৎসিত এমন ভয়ংকর হ'ল যে লাবণ্যপ্রভা প্রবলভাবে কেঁপে উঠলেন। তাঁর মনে হ'ল বজ্রপাতটা প্রকাণ্ড একটা পাহাড় ধ্বসে পড়ার মতো এই বাড়িরই ছাদের উপর ঝাঁপিয়ে নামল। ঘরের খোলা দরজা দিয়ে তার তীব্র আগুনের হল্কা তাঁকে যেন ছুঁয়ে গেল।

আর তৎক্ষণাৎ গোটা স্কুলবাড়ির বাতিগুলোও একসঙ্গে নিভে গেল। এই দিনেরবেলাতেও ঘরে-বারান্দায় আলো জ্বলছিল, টিচার্সরুমের মাঝখানটায়

পাখা ঘুরছিল। আকস্মিক বিদ্যুৎ-বিচ্ছিন্নতায় সমস্তই স্তব্ধ হতে গোটা টিচার্স-রুম ছায়া-ছায়া অন্ধকারে ডুবে গিয়ে যেন একটা পোড়োবাড়ির পরিত্যক্ত জীর্ণ ঘরে রূপান্তরিত হয়ে গেল।

বাইরে প্রবল বর্ষণ। উত্তাল বাতাস। পারাদ্বীপ থেকে ছুটে-আসা প্রচণ্ড ঝড় এতক্ষণে বুঝি গাঙ্গেয় উপত্যকায় আছড়ে পড়ল। ঝড়ে ও বর্ষণে, বিদ্যুতে ও বজ্রপাতে অকস্মাৎ প্রকৃতির এক উন্মত্ত উচ্ছৃঙ্খল তাণ্ডব শুরু হয়ে গেল।

নিঃসঙ্গ নির্জন ঘরে লাবণ্যপ্রভা হঠাৎ ভীষণ অসুস্থ বোধ করলেন। আস্তে আস্তে একটা চেয়ারে এসে বসলেন। বাজপড়ার শব্দে এমন চমকে উঠেছিলেন যে তাঁর হাত-পা-শরীর এখনো থর থর করে কাঁপছে। বুকের ভাঁজে ভাঁজে, রক্তের ভিতর উত্তপ্ত অস্থিরতা, অথচ সর্বাঙ্গের স্নায়ুগুলো কেমন অবসন্ন হয়ে আসছে! ভয়ার্ত, বিমূঢ় এক বাচ্চামেয়ের মতোই বাইরের দিকে অপলকে তাকিয়ে আছেন তিনি। দিনেরাতে একমুহূর্তও যার কথা ভুলতে পারেন না সেই সুমনের কথাই এখন অনিবার্যভাবে তাঁর মনে পড়ছে। এই ভয়ংকর প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে, এই বজ্র ও বিদ্যুতের সর্বনাশা আগুনের হল্কার মধ্যে কোন্ লোহার গারদে কোথায় আটক আছে সে? কেমন আছে! ......সুমন, বাবা, তোর হাতে যে লোহার বেড়ি, পায়ে লোহার বেড়ি! একটু সরে দাঁড়া বাবা, লোহাতে যে বাজ টানে—

ঘরের দরজায় নিঃশব্দে একজন কেউ এলেন। জীর্ণ মলিন বেশ, রোগা লম্বা-চেহারার মানুষ। বনবিহারীবাবু। তাঁর বগলে একখানা লেডিস ছাতা।

ঘরে ঢুকে আস্তে আস্তে লাবণ্যপ্রভার কাছে এসে দাঁড়ালেন। ছাতাটা টেবিলে নামিয়ে রেখে বললেন, 'কাল ফেলে গিয়েছিলেন। সুভাষী আমার কাছে জমা রেখে গেছে।'

লাবণ্যপ্রভা এমনভাবে বনবিহারীর মুখের দিকে তাকালেন যেন কিছুই শোনেন নি, শুনলেও অর্থ বোঝেন নি, যেন মানুষটাকে এই প্রথম দেখছেন!

নিষ্প্রাণ ঠাণ্ডা বরফের মতো সেই ভয়ার্ত দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে বনবিহারী কিছু বুঝলেন। ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ভাবছেন দিদি? ছেলের কথা?'

এই বৃদ্ধের কাছে মনের ভাব গোপন করলেন না লাবণ্যপ্রভা, আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়লেন। হ্যাঁ, তার কথাই ভাবছিলেন তিনি।

বাইরে প্রবল বর্ষণের ঝম ঝম শব্দ। বাতাসে জলের ঝাপটা ঘরে ঢুকছে। বনবিহারী অল্পকাল চুপ করে থেকে ছেঁড়া পাঞ্জাবির পকেট থেকে একখানা

মোটা খার্ম টেনে বের করলেন। জলে তার কিছু অংশ ভিজে গিয়েছে। হাত দিয়ে ঘষে ঘষে পরম যত্নে জলটুকু যেন শুষে নিতে চাইলেন। তারপর চারদিকে দ্রুত দৃষ্টি বুলিয়ে খামের মুখ খুলে একখানা কাগজ বের করলেন। তার অর্ধাংশে কিছু ছাপা, নিচের অংশ সাদা। লাবণ্যপ্রভার সামনে এগিয়ে ধরে বললেন, 'এতে একটা সই করবেন দিদি?'

'কিসের সই?'

'বন্দীমুক্তির, জেলখানায় যত বন্দী আছে—'

লাবণ্যপ্রভা একটুকাল চুপ করে থেকে কম্পিত হাতে কাগজখানা টেনে নিয়ে চোখের কাছে এনে ছাপার হরফে কি লেখা আছে পড়ার চেষ্টা করলেন।

বনবিহারী দরজার দিকে তাকিয়ে চাপা ভারি গলায় বললেন, 'আমার ছেলেটা বোধ হয় আর বাঁচবে না দিদি—'

লাবণ্যপ্রভার হৃদপিণ্ড ধ্বক্ করে উঠল। তিনি চকিতে মুখ তুলে তাকালেন।

বনবিহারী বললেন, 'খবর পেয়েছি, নাক মুখ দিয়ে রোজ রক্ত গড়াচ্ছে, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না! অত্যাচার তো কম হয় নি শরীরে! এই অবস্থায় এখনও নাকি লাঠি দিয়ে পেটায়। দেখা করার জন্য দরখাস্ত করেছিল মা—একবার একটু চোখের দেখা! মহারাণীর চরেরা মঞ্জুর করে নি—'

বনবিহারীর গলা রুদ্ধ হ'ল। কিন্তু লাবণ্য দেখলেন এক অসহ্য ক্ষোভ ও উত্তেজনায় এই বৃদ্ধের শীর্ণশরীর, তোবড়ানো গাল ও চোয়ালের হাড়-ঠেলে-ওঠা বয়স্ক মুখ ক্রমশ শক্তকঠিন হয়ে উঠছে! অনেক কষ্টে নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করছেন তিনি।

বাইরের হা হা বাতাস ঘরে এসে আছড়ে পড়ছে। আকাশ কাঁপিয়ে আবার কোথাও একটা বাজ পড়ল। সেই কুৎসিত ভয়ঙ্কর চরাচর ফাটানো শব্দ।

লাবণ্যপ্রভা আবার দুর্বল অবসন্ন বোধ করতে লাগলেন, সুমন......আমার সুমন...তার নাক মুখ দিয়েও কি রক্ত উঠছে...জীর্ণ বুকের হাড়-পাঁজরা মন্থন করে ঝলকে ঝলকে গরম রক্ত......

লাবণ্যপ্রভা কিছুই বলছেন না দেখে, বনবিহারী বললেন, 'সই করুন দিদি! অনেক-অনেক মানুষ সই করছেন, উকীল, ডাক্তার, মাস্টার, কেরানী। সবাই মিলে চাপ দিয়ে ছাড়িয়ে আনতে না পারলে একজনকেও বাঁচতে দেবে না ওরা। জেলের মধ্যেই মেরে ফেলবে!'

মেরে ফেলবে! একজনকেও বাঁচিয়ে রাখবে না! সুমন, আমার সুমন ......তাকেও কি বাঁচতে দেবে না......মৃত ছেলের শরীর একদিন তাকেও কি

বয়ে আনতে হবে জেলখানার দরজা কিংবা মর্গের নরক থেকে……তালগোল পাকানো একটা মাংসপিণ্ডের শরীর……যার হাতের ডানা ভেঙে দেওয়া হয়েছে, বুকের মাংস খুবলে নেওয়া হয়েছে, চোখদুটো উপড়ে ফেলা হয়েছে! সুমন… …আমার সুমন!……জলেঝড়ে কোথায় বুঝি পাগলাঘণ্টা বাজছে…..এই তো সময়, চমৎকার নিরাপদ সময়, মানুষের হৃদ্‌পিণ্ড শিকার করার সময়……

যেমন রাতের গভীরে পাহাড়ের দীর্ঘ টানেলের ভেতর দিয়ে গুম গুম শব্দে ট্রেন ছুটে যায়, যেমন উথালপাথাল ঝড়ের সমুদ্রে দিক্‌ভ্রষ্ট জাহাজের বাঁশি একটানা কাঁপাকাঁপা আর্তনাদে দিক্‌দিগন্ত ভরিয়ে তোলে—লাবণ্যপ্রভার বুকের ভেতর, রক্তের ভেতর তেমনি নিঃশব্দ এক আর্তনাদ কখনো দ্রুততালে, কখনো থেমে থেমে বেজে উঠতে লাগল। তাঁর একমাত্র ছেলে—জেলে জেলেই আজ যার বয়স সাতাশ, যার জন্য কোনো আইন নেই, বিচার নেই, আদালত নেই, আজ এখন এইমুহূর্তে বাইরের ভয়ংকর দুর্যোগ যখন প্রকৃতির সব স্বাভাবিকতা নিঃশেষে শুষে নিয়েছে, তখন সে কোনোএক জেলখানার অন্ধকার-কারাকক্ষে জীবিত কি মৃত কি মৃতকল্প অথবা এখন এইমুহূর্তেই জীবনের শেষ মার খেতে খেতে মরে যাচ্ছে, তার ঠিক-ঠিকানা কেউ জানে না, কেউ বলতে পারে না,…সাত বছর ধরে না-দেখা সাতাশ বছরের সেই সন্তানের জন্য লাবণ্যপ্রভার মাতৃকণ্ঠ যেন আকাশ-বাতাসের ঝড়বৃষ্টি ছিঁড়েখুঁড়ে অস্তিত্বের সর্বশক্তি দিয়ে চিৎকার করে উঠতে চাইল, 'ছেড়ে দাও! ছেড়ে দাও! জেলবন্দী ওদের তোমরা এমন করে মেরো না। ছে-ড়ে দা-ও……'

তারপর কাগজটা সই করতে গিয়ে হু হু শব্দে সহসা কেঁদে উঠলেন সুমনের মা—

মুক্তি চাই।

সকল রাজবন্দীর মুক্তি চাই।

ক্ষুব্ধ স্বদেশের কারান্তরালে নির্বাসিত, নির্যাতিত, জানা কি অজানা সকল রাজবন্দীর মুক্তি চাই। বিচারপ্রাপ্ত, বিচারাধীন কিংবা নির্বিচারে নিক্ষিপ্ত, স্বৈরশাসনের পাশবিক শিকার…এখন এই দেশে, দেশময় ছড়ানো অসংখ্য অগণিত বন্দীশালায়, পুত্রকন্যাপ্রিয়পরিজনযত অগণিত বন্দী, সকলের মুক্তি চাই।

অবিলম্বে বিনাশর্তে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি চাই॥